লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৪ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ২২তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ৫ রমযান, ১৪৩৮ হিজরি | ৩১ হিজরত, ১৩৯৬ হি. শা. | ৩১ মে, ২০১৭ ঈসাব্দ

গত ২৭ মে ২০১৭
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা'র উদ্যোগে দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে
খিলাফত দিবস সফলভাবে সমাপ্ত হয়

দোয়ার আবেদন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের একজন নবীন মোবাল্লেগ জনাব মোস্তাফিজুর রহমান জামেয়া থেকে পাশ করে গত দুই বছর যাবত ময়মনসিংহের সোহাগী জামাতে মুরুব্বী হিসেবে কাজ করছিলেন। সোহাগী জামাত মূলত ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার সরিষা ইউনিয়নের কানপুর গ্রামে অবস্থিত।

গত ৮ই মে, সোমবার এশা'র নামাযের পূর্বক্ষণে ৩-৪ জন যুবক আমাদের মুরুব্বী জনাব মোস্তাফিজুর রহমানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। এর পূর্বেও গত ১৩ই মার্চ একদল মোল্লা এসেছিল তাকে এবং ওখানকার আহমদীদের ওপর আক্রমণ চালাতে, কিন্তু স্থানীয় গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের প্রতিরোধে তারা একাজে ব্যর্থ হয়। এরই রেশ ধরে গত কিছুদিন ধরে গ্রুপে গ্রুপে মোল্লারা আমাদের জামাত বিষয়ে জানতে মসজিদে আসছিল।

৮ই মে, সোমবার মুসল্লি-বেশে দুর্বৃত্তরা মসজিদে আসে। তখন তিনি তাদেরকে মুসল্লি মনে করে দরজা খুলে দেন। এরপর তিনি মসজিদের আলো জ্বালাতে গেলে পেছন দিক থেকে তারা কোপানো শুরু করে। কোন রকমে তিনি সেখান থেকে দৌড়ে পাশের একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে, কিন্তু সে বাড়িতে কোন লোকজন উপস্থিত না থাকায় আক্রমণকারীরা সেখানেও ঢুকে অন্ধকারের মধ্যে তাকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে।

এসময় তাদেরই একজনের কোপে আরেকজন দুর্বৃত্ত আহত হয়ে যায়। অপরদিকে তার চিৎকার শুনে আশ-পাশ থেকে লোকজন ছুটে আসে এবং আহত দুর্বৃত্তকে ধরে ফেলে। এরই মধ্যে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয় এবং তাদের সহযোগিতায় তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে ঢাকায় নিয়ে যেতে বলে।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমানে তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে বকশি বাজার মসজিদে অবস্থান করছেন।

তার আশু আরোগ্যের জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর কাছে বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন জানানো হলো।

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official
Commercial/Industrial
Pet Bottling
46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

মাহে রমযান
রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত লাভের মাস

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে আমরা আরেকটি রমযান মাসে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ! মাহে রমযান পবিত্র সিয়াম সাধনার মাস। পবিত্র এ মাসকে তিনটি দশকে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম দশক রহমতের, দ্বিতীয় দশক-মাগফিরাতের আর তৃতীয় দশক হলো নাজাতের। রমযানের প্রাক্কালে আমাদের সবার কামনা হওয়া উচিত- আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে বেশি বেশি রহমত লাভ করা। পবিত্র এই মাসে মু'মিন-মুত্তাকীদের আধ্যাত্মিক-বাগানে ঘটবে নব-বসন্তের সমারোহ। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের একেকটি দুয়ার পেরিয়ে আনন্দে উদ্বেল হবে মু'মিন-মুত্তাকীদের হৃদয়, আলোকিত হয়ে উঠবে তাদের আধ্যাত্মিক ভূবন।

> হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে পবিত্র এই রমযানে সুস্থতার সাথে প্রবেশ করার তৌফিক দান কর এবং রহমতের দশকে আমাদেরকে তোমার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান কর।

পবিত্র এ মাস আসে আমাদের জন্য অবারিত ইবাদত-বন্দেগীর বাড়তি সুযোগ নিয়ে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মু'মিন-মুত্তাকী বান্দারা অন্বেষণ করে খোদা তা'লার প্রেম-বন্ধন। রোযার মাহাত্ম্য ব্যাপক, দিগন্ত-বিস্তৃত এই মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক জিনিসের জন্য নির্দিষ্ট দরজা থাকে আর ইবাদতের দরজা হচ্ছে রোযা' (জামেউস সগীর)। তিনি (সা.) আরো বলেছেন, 'রোযা ঢাল স্বরূপ এবং আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি নিরাপদ দূর্গ' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)। খোদা তা'লার অশেষ রহমতে আমরা রমযান মাসে প্রবেশ করছি। আমাদের প্রত্যেকের উচিত, পবিত্র রমযানের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বুঝে এ থেকে উপকৃত হওয়া। হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনে রমযানের দিনগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো, তিনি (সা.) রমযানে কত না নফল ইবাদত করতেন। অন্য সময়ের তুলনায় রমযানে তাঁর ইবাদতে গতিময়তা অত্যন্ত বেড়ে যেতো। এ মাসে তিনি কুরআন শিক্ষা, শিখানো ও শোনার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন।

এ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) রোযা সম্পর্কে বলেছেন, 'রমযান বড়ই কল্যাণমন্ডিত মাস, দোয়ার মাস'। তাই আমাদের সবার উচিত, রহমতের দশক থেকে নাজাতের দশক পর্য্যন্ত পুরোপুরি ফায়দা হাসিল করা আর এর অতুলনীয় কল্যাণরাজী দ্বারা নিজেদেরকে সুশোভিত করার সৌভাগ্য লাভ করা। রমযানে কুরআন তেলাওয়াত আর দরসের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠুক আমাদের চারপাশ। এছাড়া তারাবি, তাহাজ্জুদ, প্রভৃতি নফল নামায আর দোয়ার আহাজারিতে যেন জেগে থাকে আমাদের নিঝুম রাতগুলো।

খোদা তা'লার দরবারে আমাদের এই মিনতি, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তুমি পবিত্র এই রমযানে সুস্থতার সাথে প্রবেশ করার তৌফিক দান কর এবং রহমতের দশকে আমাদেরকে তোমার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান কর। আর সেই সাথে পুরো রমযান যেন সুস্থতার সাথে ইবাদত বন্দেগী করে তোমার নৈকট্যের কৃপা লাভ করতে পারি, সেই করুণা তুমি আমাদেরকে করো, আমীন।

সূচিপত্রে

৩১ মে, ২০১৭

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)	৬
লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ জুন, ২০১৬ **জুমুআর খুতবা**	৮
কানাডার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, মিসিসাওগায় প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ অক্টোবর, ২০১৬ **জুমুআর খুতবা**	১৭
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৬
ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত যুগ-খলীফার সফরে আশিসমন্ডিত হলো কানাডা মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	২৯
আমি কিভাবে আহমদী হলাম মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান (সিদ্দীকী)	৩২
মাহে রমযানে ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৩৭
রমযানের মাসলা-মাসায়েল মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম	৪০
সংবাদ	৪৩
আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন	৪৮

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। (এ পুরস্কারের প্রকাশ সেদিন ঘটবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে বিতন্ডা করতে করতে আসবে এবং [ঙ]প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩। [ক]আর আল্লাহ এমন এক জনপদের[১৫৮১] দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যা নিরাপদে ও শান্তিতে ছিল। সবদিক থেকে এর রিযক পর্যাপ্ত পরিমাণে এখানে আসতো, তবুও এ (জনপদবাসী) আল্লাহর অনুগ্রহরাজি অস্বীকার করলো। তাই আল্লাহ এদের কৃতকর্মের দরুন এ (জনপদকে) ক্ষুধা[১৫৮২] ও ভয়ের[১৫৮৩] আচ্ছাদনে জড়ানো এক জীবনের স্বাদ গ্রহণ করালেন।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪। আর নিশ্চয় এদের কাছে এদেরই মাঝ থেকে একজন রসূল এসেছে। কিন্তু এরা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব যুলুমে রত থাকা অবস্থায় এদেরকে আযাব ধরে ফেললো।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫। [খ]অতএব আল্লাহ প্রদত্ত রিযক থেকে তোমরা হালাল (ও) পবিত্র[১৫৮৪] খাবার খাও। আর তোমরা আল্লাহরই ইবাদতকারী হয়ে থাকলে তাঁর অনুগ্রহরাজির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

১৫৮১। এই আয়াতে বর্ণিত 'জনপদ' শব্দ দ্বারা মক্কাকে বুঝিয়েছে।

১৫৮২। এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দীর্ঘ সাত বছরব্যাপী মক্কাকে ঘিরে রেখেছিল (২৬৯৪ টীকা দ্র:)।

১৫৮৩। 'ভয়ের আচ্ছাদনে' অর্থ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীরা যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরাজিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধের সময় তারা এমন চরম ভীতিপূর্ণ অবস্থায় বাস করছিল যে, যুদ্ধের ভীতি যেন তাদেরকে 'জুজুর' ভয়ের মতো পেয়ে বসেছিল। আরবী বাগধারায় 'আযাকা' আস্বাদ গ্রহণ শব্দ কখনো কখনো লেবাস (আচ্ছাদন) এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ শ্লোক; কালু ইকতারিহ শাইয়া নুজিদ লাকা তাবখাহ, কুতলু ইতবাখুলী জুববাতাঁ ওয়া কামিসা, অর্থাৎ তারা বললো, আপনার জন্য কি পাক করবো (মানে কি খাবেন)? আমি বললাম, আমার জন্য কোট এবং একটি সার্ট পাক করুন।

১৫৮৪। ২:১৬৯, ১৭৪, ৫:৪, ৬:১১৯, ১২০ এবং ১৪৬ আয়াতের টীকাগুলো দ্রষ্টব্য।

হাদীস শরীফ

রমযান মাসের ইবাদত খোদার কাছে সবচে' প্রিয়

খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মন-মেজাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে সে তার অবাধ্য-আত্মার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে পড়ে। তখন ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে পড়ে, যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

কুরআন :

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে পার (সূরা বাকারা ১৮৪)।

হাদীস :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসুল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা :

রমযান একটি পবিত্র মাস। এ মাসের ইবাদত খোদার নিকট সবচে' প্রিয়। কারণ, নামায ও রোযার সমন্বয় মানুষের মধ্যে খোদার নৈকট্য লাভের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। তা এভাবে যে, নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। ফলশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রোযা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার এক নতুন রাস্তায় পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে চলে আসে। কুরআন বলে যে, রোযা তোমাদের মাঝে তাক্‌ওয়া অর্থাৎ খোদা-ভীতি সৃষ্টি করবে। এ তাক্‌ওয়া কিভাবে সৃষ্টি হবে? বস্তুত রোযা এমন ইবাদত, যা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিয়ন্ত্রণ করে। ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে না রেখে যদি কেউ রোযা রাখে, তবে এটা রোযা নয় বরং অন্য কিছু। খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মন-মেজাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে সে তার অবাধ্য-আত্মার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে পড়ে। তখন ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে পড়ে, যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ পূর্ণ শর্তাবলীর সাথে রোযা পালন করে, তবে তার পূর্বেকার সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এর অর্থ হলো, রমযান তাক্‌ওয়ার সৃষ্টি করে থাকে। রোযা পালনের মাধ্যমে যদি কেউ নিজের মাঝে তাক্‌ওয়া সৃষ্টি করে নেয় ও তওবাতুন নাসূহ্ করে, (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গীন তওবা দ্বারা নিজের সংশোধন করে নেয়, আর কখনও পাপের দিকে ফিরে না তাকায়), তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি খোদা দয়া পরবশ হয়ে তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

রোযার মাস সংযমের মাস, সাধনার মাস। আসুন! এ রমযানে আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি, যেন আমাদের অবাধ্য আত্মা অর্থাৎ 'নফসে আম্মারা' প্রশান্তি-প্রাপ্ত আত্মাতে অর্থাৎ 'নফসে মুতমাইন্না'তে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে পবিত্র রমযান মাসে এ সাধনা করার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

রোযার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে রময বলা হয়। যেহেতু রমযান মাসে রোযাদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ বিলাস হতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণের ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, সেজন্য এ আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান হয়েছে। আভিধানিকগণ বলে থাকেন, রমযান গ্রীষ্মকালে এসেছিলো বলে একে 'রমযান' বলা হয়েছে। আমার মতে এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা, আরব দেশের জন্যে এতে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্ম-কর্মে উদ্দীপনা। 'রময' এমন উত্তাপকেও বলা হয় যাতে পাথর প্রভৃতি পদার্থ উত্তপ্ত হয়"। (আল্ হাকাম, ২৪শে জুলাই, ১৯০১ ইং)

"যার অন্তর এ কথায় আনন্দিত যে, রমযান এসেছে এবং সে এ প্রতীক্ষায় ছিল যে, রোযা এলেই রাখবে, অথচ অসুস্থতার জন্যে রোযা রাখতে পারে না, এরূপ ব্যক্তি আকাশে রোযা হতে বঞ্চিত হবে না। দুনিয়ার অনেক লোক বাহানা খুঁজে এবং ভাবে, দুনিয়ার মানুষকে আমি যেরূপ ধোঁকা দিচ্ছি সেভাবে খোদাকেও ধোঁকা দিচ্ছি। বাহানাকারী নিজের পক্ষ হতে মসলা বানিয়ে নেয় এবং ওজরগুলোকে শামিল করে মসলাগুলোকে সহী সাব্যস্ত করে। কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে সেগুলো সহীহ্ নয়। ওজর ও বাহানার দরজা খুবই বিস্তৃত। মানুষ চাইলে এ দিয়ে সারা জীবন বসে নামায পড়তে পারে এবং রোযা একেবারেই না রাখতে পারে। কিন্তু খোদা তার নিয়্যত ও ভাবধারা অবগত যার সততা ও আন্তরিকতা আছে। খোদা জানেন, তার অন্তরে দরদ রয়েছে। খোদা তাকে আসল পুণ্য হতে অধিক দান করেন। কারণ, মর্মবেদনা মর্যাদার বিষয়। বাহানাকারী ব্যাখ্যার উপর ভরসা করে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এ ভরসার কোন মূল্য নেই।" (আল্ হাকাম, ১০/১২/১৯০২ ইং, পৃঃ ৯)

রোযার হকীকত সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মশুদ্ধির জন্যে আবশ্যক। এতে দিব্য-দর্শন শক্তি (কাশ্ ফী-তাকত) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা যে একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর 'ঐশীকোপ' (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে। কিন্তু রোযাদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, রোযার অর্থ শুধু এটা নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে। বরং খোদার যিক্‌র অর্থাৎ তাঁর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। আঁ হযরত (সা.) রমযান শরীফে অনেক বেশি ইবাদত করতেন। এ দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোনিবেশ (তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্) করা চাই। দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আধাত্মিক-খাদ্যের জন্যে পরওয়া করে না। বাহ্যিক-খাদ্যে দৈহিক-শক্তি লাভ হয়। একইভাবে, আধ্যাত্মিক-খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং এতে আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার কাছে সাফল্য চাও। কারণ, তিনি সামর্থ্য দিলেই সব দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।"

আহারে দেহ শক্তিশালী হয় এবং রোযার মাধ্যমে অনাহারের ফলে আত্মা শক্তিশালী হয়। জড় অনাহারকে যিক্‌রে ইলাহী দিয়ে পূরণ করতে হয়। কারণ, যিক্‌রে ইলাহী আত্মার খোরাক। জড়খাদ্য ও ভোগবিলাসে আত্মা মৃতবৎ হয়ে যায় এবং রোযার মাধ্যমে যিক্‌রে ইলাহীতে আত্মা জাগ্রত, সতেজ ও ঐশী-শক্তিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন, "কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয়, বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে, যা অভিজ্ঞতায় বোঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মাঝেই এটা নিহিত আছে যে মানুষ যত কম খায় ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং কাশ্ ফী তাকত বা দিব্যদর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় এটাই, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারের কর্তব্য সব সময়েই এর প্রতি দৃষ্টি রাখা, খোদা তা'আলার যিক্‌র বা স্মরণেই সময় কাটানো উচিত, যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য হলো– মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে। এ রোযা আত্মার প্রশান্তি এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যেই রোযা রাখে এবং আচার অনুষ্ঠানের রোযা নয়, তার উচিত, সব সময় হামদ (প্রশংসা কীর্তন), তসবীহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা) এবং তাহ্‌লীলের (আল্লাহ্‌র তৌহীদ ঘোষণা) মাঝে নিজেকে যেন নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়"। (আল্ হাকাম, ১৭/০১/১৯০৭ ইং)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩৮তম কিস্তি)

(৩) প্রশ্ন : হযরত মসীহ্‌র পুনরাগমন খন্ডনে এ মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণিত আর প্রত্যেক সত্যপরায়ণ মুমিন মারা যাওয়ার পরে পরে জান্নাতে প্রবেশ করে থাকে এবং 'ওয়া মা হুম মিন্‌হা বি-মুখরাজীন' [অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশকারীদেরকে সেখান থেকে আর কখনও বহিষ্কার করা হবে না' (সূরা আল হিজর ঃ ৪৯)] আয়াত অনুযায়ী জান্নাতে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তি চিরকাল বেহেশ্‌তে থাকার অধিকার রাখে– উপস্থাপিত এই যুক্তি সঠিক নয়। কেননা, এটি যদি সঠিক হয়, তাহলে উযাইর নবী সম্পর্কে কুরআন করীমে এমর্মে বর্ণিত বৃত্তান্তটি সত্য নয় যে তিনি একশ' বছর যাবৎ মৃতাবস্থায় থাকার পর খোদা তা'লা তাঁকে পুনরায় জীবিত করেন। এ কারণেই সত্য নয় যে, উযাইর নবীর পুনর্জীবিত হওয়ায় উপরোল্লেখিত স্বীকৃত-নীতি অনুযায়ী এটা মানতে হবে যে তাঁকে বেহেশ্‌ত থেকে বের করা হয়েছিল। আর তেমনি, মৃতদের কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়া এবং হিসাব-নিকাশের তথা হাশরের ময়দানে রাব্বুল-আলামীনের সকাশে তাদের উপস্থিত হওয়া– এসবই উপরোল্লেখিত আয়াতের বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থ করার দরুন অর্থাৎ এ অর্থ করার দরুন যে, সত্যপরায়ণ মু'মিনগণ মারা যাবার পরে পরে তৎক্ষণাৎ জান্নাতে প্রবেশ করেন এবং এরপর তাদেরকে আর কখনও বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কার করা হয় না– উল্লিখিত এসব বিষয়ই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয় এবং ইসলামের সর্বস্বীকৃত আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর এক বিপর্যয় উপস্থিত হয়।

উত্তর : অতএব জানা আবশ্যক, প্রকৃতপক্ষেই এটা সত্য যে, বেহেশ্‌তে যাদেরকে প্রবেশ করানো হয় তাদেরকে কখনও আর বহিষ্কার করা হয় না। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু মু'মিনদের অলঙ্ঘনীয় এ সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন : **'লা ইয়ামাসসুহুম ফিহা নাসাবুন ওয়া মা হুম মিনহা বি-মুখ্‌রাজিন।'** অর্থাৎ বেহেশ্‌তে প্রবেশকারীগণ সবরকম দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং তাদেরকে কখনও আর বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কার হরা হবে না (সূরা আল্ হিজর ঃ ৪৯ পারা নং ১৪)। আরেক জায়গায় বলেন : **'ওয়া আম্মাল্লাযিনা সুয়িদু ফা-ফিল জান্নাতি খালিদীনা ফিহা মা দামাতিস্ সামাওয়াতু ওয়াল্ আরযু ইল্লা মা শায়া রাব্বুকা আতায়ান গাইরা মাজ্‌যুয।'** অর্থাৎ সৌভাগ্যবান লোক মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে, যতক্ষণ আকাশ ও পৃথিবী বহাল থাকবে এবং এ আকাশ ও পৃথিবীকে যদি বদলেও দেয়া হয়– যেমনটি কিয়ামত দিবস উপস্থিত হলে সংঘটিত হবে– তবুও সৌভাগ্যবান লোকদেরকে বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কার করা হবে না এবং সবকিছু নষ্ট হয়ে গেলেও বেহেশ্‌ত কখনও বিকারগ্রস্ত হতে পারে না। কেননা, বেহেশ্‌ত তাদের জন্যে এমন এক প্রতিদান, যা থেকে তারা কখনও বিচ্ছিন্ন বা বঞ্চিত হবে না।' (সূরা হুদ, পারা ১২)।

আর তেমনি কুরআন করীমের অন্যত্রও বেহেশ্‌তীদের সদাসর্বদা বেহেশতে বসবাস করার কথা সারা কুরআন জুড়ে উল্লেখ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন : **'ওয়া লাহুম ফিহা আয্‌ওয়াজুম্ মুতাহ্‌হারাতুন ওয়া হুম ফিহা খালিদূন'** (আল বাকারাহ্ ঃ ২৬) 'উলাইকা আসহাবুল জান্নাতি হুম ফিহা খালিদুন'। (আল্ বাকারাহ্ ঃ ৮৩) ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আর এ-ও স্পষ্ট যে, অন্তর্ধানের পর মু'মিনকে তৎক্ষণাৎ বেহেশ্‌তে স্থান দান (বা স্থানান্তরিত) করা হয়। যেমন, এ আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে ঃ (১) **'কিলাদ্ খুলিল্ জান্নাতা কালা ইয়ালাইতা কাওমি ইয়া'লামুনা বিমা গাফারালি রাব্বি ওয়া জায়ালনি মিনাল মুক্‌রামিন।'** [অর্থঃ তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, 'হায়' আমার জাতি যদি জানতে পারত, আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন' (সূরা ইয়াসীন ঃ ২৭-২৮) –অনুবাদক]।

(২) **'ফাদ্ খুলি ফি ইবাদি ওয়াদ্ খুলি জান্নাতি।'** (সূরা আল্ ফাজর ঃ ৩০, ৩১)।

(৩) **'ওয়ালা তাহ্‌সাবান্নাল্ লাযীনা ক্বুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতান বাল্**

আহ্‌ইয়াউন ইন্দা রাব্বিহীম ইউরযাকুন ফারিহিনা বিমা আতা হুমুল্লাহু বি ফাযলিহি' (আলে ইমরান ঃ ১৭০-১৭১)।

হাদীসাবলীতে এতো বিপুল পরিমাণে এ সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে যা পুরোপুরি লেখা হলে বিষয়টি দীর্ঘায়িত হবে। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেন ঃ 'আমাকে দোযখ দেখানো হয়, সেখানে আমি বেশির ভাগ স্ত্রীলোকদেরকে দেখতে পাই। এরপর আমাকে বেহেশ্‌ত দেখানো হয়, সেখানে আমি অধিকাংশ গরীবদেরকে প্রত্যক্ষ করেছি।' আর ইঞ্জিল লুক, ১৬ অধ্যায়ে একটি কেচ্ছাস্বরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, 'লা'জর নামের এক গরীব ব্যক্তি মারা গেলে তাকে ইব্রাহীম (আ.)-এর কোলে তুলে দেয়া হয় অর্থাৎ নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে রাখা হয়। কিন্তু একজন ধনী ব্যক্তি সে-সময়ে মারা গেলে তাকে নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সে লা'জরের কাছে ঠান্ডা পানি চাইলে তাকে তা দেয়া হয় নি।'

এছাড়া, এমন আয়াতসমূহও রয়েছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, 'হাশর' বা 'পুনরুত্থান সমাবেশ' হবে এবং হিসাব-নিকাশের পর বেহেশ্‌তীদেরকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাওয়া হবে এবং দোযখীদেরকে দোজখে ঢুকানো হবে। এ উভয় শ্রেণীর আয়াতসমূহে আপাতদৃষ্টে স্ববিরোধ আছে বলে মনে হয়। কিন্তু কুরআন করীমে ও হাদীসাবলীতে মৃত্যুর পরে পরে পবিত্র আত্মাদের বেহেশ্‌তে প্রবেশ লাভ সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে প্রমাণিত। এমন একটিও আয়াত বা হাদীস খুঁজে পাওয়া যাবে না যাতে প্রমাণিত হয় যে, 'হিসাব-নিকাশ দিবসে' (তথা হাশরে) বেহেশ্‌তবাসীদের বেহেশ্‌ত থেকে বের করা হবে। পক্ষান্তরে ঐশী-প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বেহেশ্‌তবাসীদেরকে চিরকাল বেহেশ্‌তে অবস্থান করার কথা কুরআন করীম ও হাদীসাবলীতে বহু জায়গায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে অন্য দিকে এ-ও প্রমাণিত যে, কবর থেকে মৃতদের পুনরুত্থান হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির আমল ও ঈমানের ঐশী-তুলাদন্ডে পরিমাপ তার সামনে তুলে ধরা হবে। এরপর বেহেশ্‌তের উপযোগী লোকদেরকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হবে, আর যারা দোযখে জ্বলার উপযুক্ত তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

এখন জানা আবশ্যক যে, পবিত্র আয়াত ও হাদীসসমূহে বিদ্যমান স্ববিরোধটি নিরসনের উদ্দেশ্যে এ পন্থা প্রযোজ্য নয় যে, এমর্মে এ আকিদা-বিশ্বাস তুলে ধরা যায় যে, মৃত্যুর পর সমস্ত মানবাত্মা এক 'ফানা' তথা অনস্তিত্ব ও বিলোপ-সুলভ এমন অবস্থায় পড়ে থাকে, যেন তারা কোনো সুখ-শান্তির অধিকারী হয় না, আর কোনো রকম শাস্তি-কবলিত অবস্থায়ও পড়ে থাকে না। না জান্নাত থেকে আসা শীতল বাতাসে তাদেরকে প্রাণ জুড়ায়, আর না দোজখের উষ্ণবায়ু এসে তাদের পোড়ায়! কেননা এ রকম ভাব-ধারণা বা বিশ্বাস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রাঞ্জল ভাষ্যসমূহের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পরলোকগত ব্যক্তির জন্যে যে দোয়া করা হয় বা সদকা-খয়রাত দান করা হয় এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে মিসকিন ও অভাবী লোকদেরকে খাবার খাওয়ানো হয় বা কাপড় ইত্যাদি দান করা হয়– পুনরুত্থানের পূর্বের মধ্যবর্তী সময়কালে যদি পরলোকগত মানুষদের সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম একেবারে সম্পর্কহীন হয়ে থাকে, তাহলে (শরীয়ত নির্দেশিত) এসব উল্লেখিত আমল ও যাবতীয় সৎকাজ এই দর্ঘকাল ব্যাপী বৃথা বলে বিবেচিত হবে এবং এই মধ্যবর্তী সময়টিতে পরলোকগামীদের সুখ–শান্তি বা দুঃখ-কষ্ট এবং সওয়াব (পুরস্কার) বা শাস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক-সম্বন্ধ বিরাজ করে না বলে সাব্যস্ত হবে। অথচ এরূপ ধারণা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত শিক্ষামালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

অতএব সেই প্রকৃত-বিষয়টি, যার দরুন উল্লিখিত উভয় প্রকার আয়াতসমূহে আপাতদৃষ্টে প্রতীয়মান স্ববিরোধ দূর হয়, সে বিষয়টি হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নাম তিনটি স্তর বা ধাপে বিভক্ত। **প্রথম ধাপ বা স্তরটি** যা এক সামান্য বা অতি সামান্য ক্ষুদ্রাকার স্তর, এর সূচনা হয় তখন থেকে, যখন মানুষ এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে তার চিরনিবাসস্থল (আল্লাহ্ নির্ধারিত) কবরে সায়িত হয়। অতি লাজুক এই স্তরটির স্বরূপ রূপক ভাষায় পবিত্র হাদীসাবলীতে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যকার একটি হচ্ছে, একজন মৃত সৎ বান্দার জন্য কবরে জান্নাতের দিকে একটি জানালা সমান পথ খোলা হয়, যে-পথ দিয়ে সে জান্নাতের সুদৃশ্য বাগান ও এর অন্যসব সমারোহ অবলোকন করে এবং এর মনোরম সমিরণ উপভোগ করে থাকে। সে-জানালাটির প্রশস্ততা মৃতব্যক্তির ঈমান ও আমল তথা সৎকর্মের মান অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু একই সাথে এ-ও লেখা আছে যে, যাঁরা 'ফানা ফিল্লাহ্' তথা আল্লাহ্‌তে বিলীয়মান অবস্থায় ইহজগৎ ত্যাগ করে থাকেন, তাঁরা তাদের প্রিয় জীবন বা মূল্যবান প্রাণ তাঁদের প্রকৃত প্রিয় আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দেন। যেমন, শহীদগণ বা সিদ্দীকগণ, যাঁরা শহীদের চেয়েও বহুগুণ অগ্রগামী হয়ে থাকেন তাদের অন্তর্ধানের পর তাঁদের জন্যে কেবল বেহেশ্‌তের দিকে জানালাই খোলা হয় না, বরং তাঁরা তাঁদের সমস্ত সত্তা ও সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তিনিচয় সহ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিয়ামত দিবসের পূর্বে সর্বোচ্চ মাত্রায় ও পূর্ণতম ধারায় জান্নাতের সার্বিক স্বাদ উপভোগে অভিসিক্ত হতে পারেন না।

অনুরূপভাবে, এ স্তরটিতে মন্দ মৃতব্যক্তির জন্যে 'কবরে' একটি জানালা (সমান পথ) খোলা হয়, যে-পথ দিয়ে দোজখের প্রজ্বালনকারী বাষ্প আসতে থাকে এবং এর অগ্নিশিখায় তারা জ্বলতে থাকে। কিন্তু একই সাথে এ-ও নির্ধারিত রয়েছে যে, যারা তাদের অতিমাত্রায় অবাধ্যতার দরুন 'ফানা ফিশ্‌শায়তান' তথা শয়তানের আনুগত্যে এমন আত্ম-হারা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় যে, শয়তানের আনুগত্যের কারণে তারা তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তাদের জন্য তাদের মৃত্যুর পর কেবল দোজখের দিকে জানালাই খোলা হয় না, বরং তারা তাদের সমস্ত সত্তা ও শক্তিনিচয় সহ বিশেষ দোজখে তাদের ছুঁড়ে দেয়া হয়। যেমন আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' বলেন : **মিম্মা খাতিয়াতিহীম উগ্‌রিকু ফা উদ্‌খিলু নারান'** অর্থাৎ এদের পাপাচারের দরুন এদেরকে ডুবিয়ে দেয়া হলো, এরপর আগুনে প্রবেশ করানো হলো' (সূরা নূহ্ ঃ ২৬) অনুবাদক]। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব লোক 'কিয়ামত দিবস'-এর আগে পরিপূর্ণ ও সার্বিক ভাবে জাহান্নামের স্বাদ ভোগ করে না।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

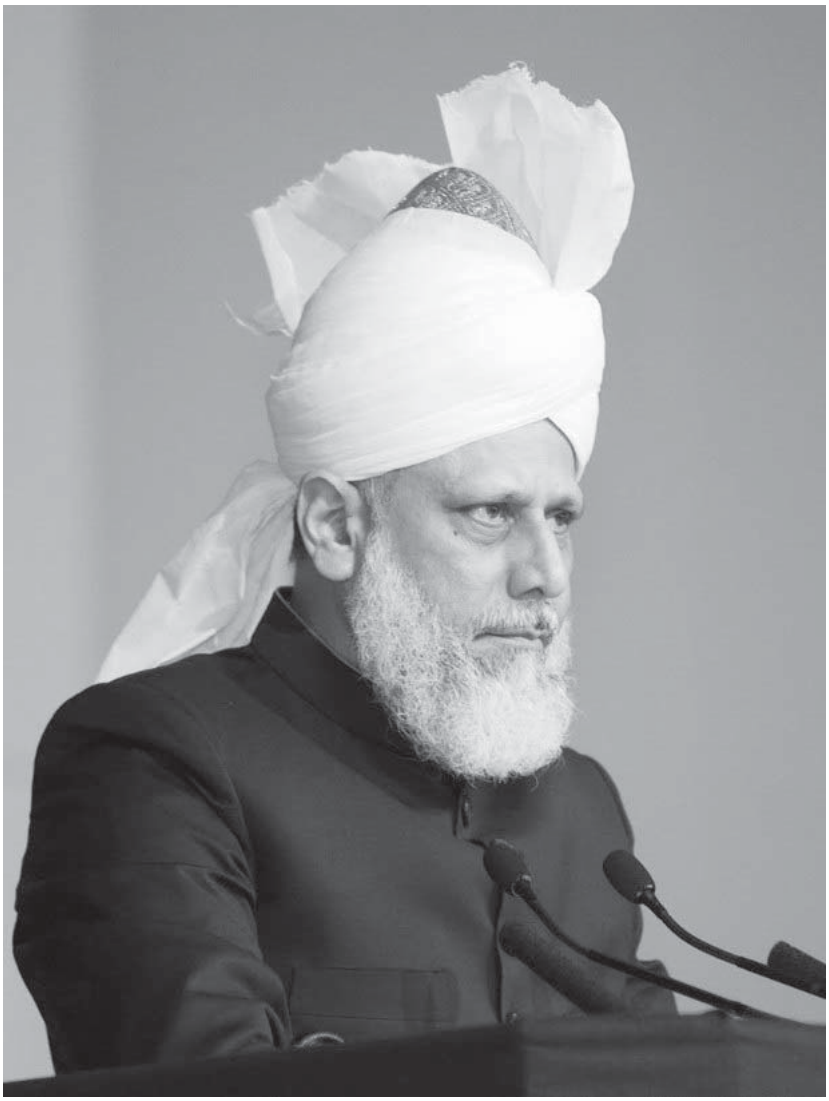

জুমুআর খুতবা

রমযানের প্রেক্ষাপটে একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৪ জুন, ২০১৬ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকা, তাঁকেই সকল শক্তির আধার জেনে তাঁরই কাছে যাচনা করা এবং তাঁর নির্দেশনাবলী মেনে চলা আবশ্যক। এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশগুলো কী? গত খুতবায়ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কুরআনের মত মহান গ্রন্থ দান করেছেন, যাতে খোদার সকল নির্দেশ এবং আদেশ ও নিষেধের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন, "ফালইসতাজিবু লি" (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ, আমার বান্দারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়। এর অর্থ কুরআনে যেসব নির্দেশ রয়েছে, সেগুলোকে তাদের শিরোধার্য করা উচিত। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা দোয়াও গ্রহণ করবেন আর হিদায়াতও লাভ হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অবশেষে কী ফলাফল প্রকাশ পাবে, লায়াল্লাহুম ইয়ারশুদুন (সূরা আল্-বাকারা:

দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকা, তাঁকেই সকল শক্তির আধার জেনে তাঁরই কাছে যাচনা করা এবং তাঁর নির্দেশনাবলী মেনে চলা আবশ্যক। এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশগুলো কী? গত খুতবায়ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কুরআনের মত মহান গ্রন্থ দান করেছেন, যাতে খোদার সকল নির্দেশ এবং আদেশ ও নিষেধের উল্লেখ রয়েছে।

১৮৭) অর্থাৎ, তারা যেন সঠিক পথ পায় আর এই হেদায়াত লাভের কল্যাণে আমার নৈকট্য প্রাপ্তির দৃশ্য তারা প্রত্যক্ষ করে। তাদের এমনই হওয়া উচিত, যারা হবে সঠিক পথের পথিক এবং তাদের জন্য থাকবে পথ-নির্দেশনা। আর তারা সৎকর্ম পরায়ন, পাপ বর্জনকারী এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনকারী হবে এবং উন্নত নৈতিক গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে চলবে। এখন প্রশ্ন হল, এ সব বিষয়ের প্রয়োজন কি শুধু রমযানেই রয়েছে, যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে? আর আমরা যদি রমযান মাসেই খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলি, তবে কি শুধু রমযানে আমল করার সুবাদেই স্থায়ী হেদায়াত লাভ হবে? রমযান তো ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আসে এবং এসেছে যে, প্রশিক্ষণ ও সংগ্রামের এই মাসে আমরা যেন প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং সংগ্রামে রত থেকে পরস্পরের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের রাস্তা সন্ধান করি। সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হয়ে তাঁর নিকটতর হই এবং আমাদের দোয়াগুলোকে এর গৃহীত হওয়ার মার্গে পৌঁছানোর চেষ্টা করি, এর ফলে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার স্থায়ী নৈকট্যভাজন হয়ে আমাদের উভয় জগৎকেই সুশোভিত করে তুলতে পারি। আমাদের অনেকেই আছেন, যারা উন্নত মানের আমল ও ইবাদতকারী এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। এ জন্য এ দিনগুলোতে যখন আমরা সমবেত হই আর পরস্পরকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেখার সুযোগ পাই, তখন এর মাধ্যমে যেন আমাদের নিজেদের অবস্থার প্রতিও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

কুরআনে অগণিত আদেশ-নিষেধ রয়েছে। যেখানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে (কোন কাজ) করতে অথবা না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন সময় সেগুলোকে আমাদের রোমন্থন বা পুনরাবৃত্তি করা উচিত। এমনই কিছু নির্দেশাবলী আমি এখন উপস্থাপন করছি।

সবচেয়ে মৌলিক যে নির্দেশটি সবর্দা আমাদের সামনে রাখা উচিত এবং যা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও বটে, তা হল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ইল্লা লিইয়া'বুদুন"(সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) এ আয়াতের অনুবাদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে করেছেন যে, "আমি জিন্ন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (বারাহীনে আহমদীয়া, তৃতীয়াংশ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫ টীকা)

এই বিষয়টি আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার বলেছি এবং বারবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণও করে থাকি। কিন্তু আমাদের অনেকেই কিছুদিন এটি স্মরণ রেখে আবার ভুলেও যায়। আমি জানি, এমনকি দেখেছি যে, কতক ওয়াকফে জিন্দেগী, বরং যারা ধর্মীয় জ্ঞানও অর্জন করেছে আর জ্ঞানের দিক থেকে এর গুরুত্ব সম্পর্কেও অবগত, তারাও এদিকে সেভাবে দৃষ্টি দেয় না, যেভাবে দেয়া উচিত। এছাড়া জামা'তের ওহদাদার বা পদধারী কর্মকর্তারাও রয়েছেন, যারা মিটিংয়ে নিজেদের জ্ঞানগত যোগ্যতা প্রকাশের চেষ্টা করে, কারো কোন সমস্যা উপস্থাপিত হলে তাকে তারা কুরআন হাদীসের আলোকে বুঝিয়েও থাকে। কিন্তু অনেকেই এমন আছে, যারা নিজেরা মৌলিক এই নির্দেশের উপর সেভাবে দৃষ্টি দেয় না, যেভাবে দেয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "এ কথাটি তোমরা ভালোভাবে অনুধাবন কর যে, তোমাদের সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হল, তোমরা যেন তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁরই হয়ে যাও। এই বস্তু-জগতই যেন তোমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য না হয়। এ বিষয়টি আমি বারবার বর্ণনা করি। এর কারণ হল, আমার মতে এই একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, অথচ এটি থেকেই সে বহু যোজন দূরে অবস্থান করছে। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩-১৮৪,সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

এই বিষয়টিকে আরো খোলাসা করে তিনি (আ.) বলেছেন যে, এই বস্তু-জগতকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির না করার অর্থ এটি নয় যে, জাগতিক কার্যকলাপ তোমরা আদৌ করবে না।পার্থিব কাজকর্ম অবশ্যই করবে, কিন্তু ইবাদতের যে দায়িত্ব রয়েছে, বরং বলা উচিত, সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য, তা যেন সর্বাগ্রে তোমাদের কাছে প্রাধান্য পায়।

রমযান হওয়ার কারণে আজকাল সাধারণভাবেই এর উপর আমল হচ্ছে।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে এশার নামায অনেক দেরিতে হয়। নামায শেষ করতে এগারটা থেকে সোয়া এগারটা বেজেই যায়। এরপর কেউ কেউ তারাবির নামাযও পড়ে। মসজিদে তারাবির ব্যবস্থাও আছে, যার ফলে বাড়ি ফিরে ঘুমাতে ঘুমাতে বারোটা, সাড়ে বারোটা বেজে যায়। আবার দুইটা-আড়াইটায় সেহরী খাওয়ার জন্য জেগে উঠতে হয়। কেউ কেউ নফল নামাযও (তাহাজ্জুদ) পড়ে এবং নামাযের জন্য মসজিদেও আসে। অতএব, এটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি ইচ্ছা থাকে, অর্থাৎ- শুধু জ্ঞানগত গুরুত্বই নয় বরং বাস্তব-প্রচেষ্টাও থাকে, তাহলে উন্নত মানের ইবাদত-ক্ষেত্র নামাযে আলস্য দেখাবেন না, বরং সচেষ্ট হয়ে মসজিদে আসুন। মসজিদে এসে জামা'তের সাথে নামায পড়াও আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অন্তর্গত। অতএব, এই রমযানে ওয়াকফে জিন্দেগী, যাদের অঙ্গীকার রয়েছে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়া সবার মাঝে অগ্রগামী হওয়ার জন্য আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করব এবং ওহদাদার বা পদধারী কর্মকর্তা, যাদের প্রতি মানুষের দৃষ্টি রয়েছে আর তাদেরকে তারা নির্বাচনও এজন্যই করে থাকে যে, আমাদের মাঝে তারা সর্বোত্তম, এদের উভয়ের (অর্থাৎ, ওয়াকফে জিন্দেগী ও কর্মকর্তাদের) আদর্শ-স্থানীয় হওয়া উচিত। এ বিষয়ে তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত যে, কেবল রমযান মাসেই আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পন্থায় ইবাদত করার প্রতি মনোযোগী হব না এবং এভাবে কেবল দিনই গুনে যাব না যে, আর মাত্র বারো বা তের দিন রয়ে গেছে, এরপরই আমরা আমাদের পুরোনো অভ্যাস বা রুটিনে ফেরত যাব। বরং চেষ্টা করতে হবে, এই রমযানের প্রশিক্ষণ এবং সংগ্রাম ও সাধনা আমাদের মাঝে ইবাদতের যে চেতনতা সৃষ্টি করেছে, সেটিকে আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করতে হবে আর আমাদেরকে দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে হবে। যেভাবে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্বৃতি উপস্থাপন করেছি, যেখানে তিনি গভীর বেদনার সাথে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন যে, আমি বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করি। এই প্রেক্ষাপটে আমি তাঁর আরো কিছু উদ্বৃতি উপস্থাপন করব, যার মাধ্যমে এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মানব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র উদ্দেশ্য যখন তাঁর ইবাদত করা, তখন অন্য কিছুকে তার একান্ত লক্ষ্য স্থির করা কোন মু'মিনের জন্য শোভনীয় নয়। মানবাত্মার স্বভাবগত বৈশিষ্ট সংরক্ষণ করা বৈধ হলেও প্রবৃত্তির ভারসাম্যহীনতা বৈধ নয়। নফসের অধিকার রক্ষা করা বৈধ হওয়ার কারণ হল, এটি যেন আবার অক্ষম হয়ে না যায়। তোমরাও এ জিনিসগুলোকে এ উদ্দেশ্যেই কাজে লাগাও। এগুলোকে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার কর, যেন তা তোমাদেরকে ইবাদতের যোগ্য করে রাখে। সেগুলোই তোমাদের মূল লক্ষ্য হবে, এর অন্যথা হওয়া ঠিক নয়। (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮-২৪৯,সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

নফসের অধিকার প্রদানের কথা হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের উপর তোমাদের নফসেরও অধিকার রয়েছে। (সাহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সওম, বাব- মাসন আকসামা আলা .... হাদীস নম্বর ১৯৬৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে এ অধিকার রয়েছে, কিন্তু এতে ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। নফসের বৈধ অধিকার প্রদান কর। কেননা, এই অধিকারের বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'লা মানব প্রকৃতির অংশ বানিয়ে দিয়েছেন। তাই, এগুলো প্রদান করা তো অবশ্যই প্রয়োজন। এগুলোকে নিজেদের কাজে নিয়োজিত কর। অন্যথায়, কিছু কিছু জিনিস এমন আছে, যেগুলোকে ব্যবহার না করলে অর্থাৎ, নফসের অধিকার প্রদান না করলে কিছু অনুভূতি বা ইন্দ্রিয়-শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। আর এটি মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়, বরং ইবাদতের পাশাপাশি এগুলো ব্যবহার করাও আবশ্যক। খোদা-সৃষ্ট বিশেষত্ব ও শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগানো আবশ্যক। আর সেগুলোকে ব্যবহার না করা খোদার প্রতি অকৃতজ্ঞতার শামিল। একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, বেশ-ভূষার প্রতি তার কোন দৃষ্টি ছিল না, এমনকি সে চুলও আঁচড়াত না। মহানবী (সা.)-এর সমীপে তার সম্পর্কে কেউ নিবেদন করে যে, সে এভাবে

> কুরআনে অগণিত আদেশ-নিষেধ রয়েছে। যেখানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে (কোন কাজ) করতে অথবা না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন সময় সেগুলোকে আমাদের রোমন্থন বা পুনরাবৃত্তি করা উচিত। এমনই কিছু নির্দেশাবলী আমি এখন উপস্থাপন করছি।
>
> সবচেয়ে মৌলিক যে নির্দেশটি সর্বদা আমাদের সামনে রাখা উচিত এবং যা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও বটে, তা হল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা।

থাকে। মহানবী (সা.) তাকে ডেকে পাঠালেন। এসে তিনি (মহিলা সাহাবী) বলেন, আমি পরিপাটি থাকব কার জন্য? আমার স্বামী তো দিনেও ইবাদত করে আর রাতেও ইবাদত করে। এ কথা শুনে মহনবী (সা.) তার স্বামীকে ডেকে এনে বললেন, তোমার উপর তোমার নফসেরও অধিকার রয়েছে আর তোমার স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৩১, হাদীস নম্বর: ২৬৮৩৩৯, ... আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮ইং-প্রকাশিত।)

অতএব, সকল প্রকার অধিকার প্রদান করা আবশ্যক, তবুও সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সর্বাবস্থায় অগ্রগণ্য রাখতে হবে। নফসের অধিকার প্রদান করা হলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে আর স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সঠিকভাবে ইবাদত করা সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, "অযথা ব্যবহারের ফলে হালাল বা বৈধ জিনিসও হারাম বা অবৈধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ইল্লা লিইয়া'বুদুন (সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) থেকে বুঝা যায় যে, মানুষকে কেবল ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যতটুকু তার প্রয়োজন এরচেয়ে বেশি নিলে তা হালাল বা বৈধ হলেও অতিরিক্ত হওয়ার কারণে তার জন্য তা হারাম বা অবৈধ হয়ে যায়।" সব কিছুর বৈধ ব্যবহার যথার্থ, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে হালাল জিনিসও হারাম হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, "প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণের জন্য যে ব্যক্তি দিনরাত ব্যস্ত থাকে, সে কিভাবে ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে পারে? মু'মিনের জন্য আবশ্যক, সে যেন এক নির্মোহ বা কঠোর জীবন যাপন করে, অন্যথায় বিলাসিতায় মগ্ন থাকলে তো সে জীবনের এক দশমাংশও অর্জন করতে সক্ষম হবে না। (মলফূযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৮, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হল, স্বীয় প্রভুকে চেনা এবং তাঁর আনুগত্য করা। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ইল্লা লিইয়া'বুদুন (সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭)। অর্থাৎ, আমি জিন্ন ও মানুষকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, পৃথিবীতে জন্ম নেয়া অধিকাংশ মানুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরিবর্তে এবং নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিতে না রেখে আল্লাহ্ তা'লার আঁচল ছেড়ে দিয়ে পার্থিব জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও সম্মান লাভের আসক্তিতে এমনভাবে মজে যে, তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র অংশ খুব কমই থাকে আর অনেক মানুষের হৃদয়ে তো থাকেই না। কেননা, তারা জগৎ-প্রেমে মত্ত ও বিভোর হয়ে যায়। খোদা বলতে কেউ আছেন, এটিও তারা জানে না। তারা কেবল তখনই বুঝে, যখন আজরাঈল এসে রূহ কবজ করে। [আল হাকাম, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, পৃ. ১, ৮ম খণ্ড, সংখ্যা ৩২, উদ্ধৃতি, তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯]

পার্থিব জীবনের ঝামেলা ও ঝঞ্ঝাট থেকে তারা কেবল তখন বের হয়, যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। বরং অধিকাংশ দুনিয়াদার বা বস্তুবাদী মানুষের অবস্থা এমন যে, মৃত্যুর সময়ও তারা বৈষয়িক ধনসম্পদ এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েই চিন্তাগ্রস্ত থাকে। এক মু'মিনের অবস্থা এমন হয় না যে, মৃত্যুর সময় তার দৃষ্টি কেবল পার্থিব সহায়-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিই নিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু অনেকেই এমন আছে, যারা ঈমান আনা সত্ত্বেও সুস্থ্য থাকা অবস্থায় জীবনের যে উদ্দেশ্য রয়েছে, তা ভুলে গিয়ে জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি নিয়ে বেশি চিন্তিত থাকে। অতএব, আমাদের সবার এই চিন্তা অগ্রগণ্য রাখা উচিত যে, আমরা যেন জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি। আর এই রমযানে এবং এরপরও যেন আমাদের মনোযোগ খোদার ইবাদতের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আর এর জন্য মসজিদ আবাদ করার যে নির্দেশ রয়েছে, সেটিকে আমাদের দৃষ্টিপটে রাখতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, মানুষের হৃদয়ে খোদার নৈকট্য লাভের এক বেদনা থাকা চাই, খোদার নৈকট্য লাভের জন্য মরমে এক ব্যথা থাকা উচিত, যার ফলে তাঁর, অর্থাৎ- আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে মূল্যায়নের যোগ্য হয়ে যায়। (মলফূযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

খোদার নৈকট্য লাভে কাতর এক বেদনা যখন হৃদয়ে সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সেই মানুষ মূল্যায়নের যোগ্য হয়ে যায়।

অতএব, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে যে মূল্যায়নযোগ্য হয়, সে-ই আসলে সত্যিকার হিদায়াত প্রাপ্ত, সঠিক পথের দিশা প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় পাত্র। নামায ও ইবাদতের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা আরো বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন। সূরা নূরে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন সুপুরুষও আছে, যাদেরকে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ বা নামায কায়েম অথবা যাকাত প্রদানে উদাসীন করতে পারে না। তারা সেই দিনকে ভয় করে, যেদিন হৃদয় ও দৃষ্টি ভয়ে উদ্বেগাকুল হবে (সূরা আন্-নূর: ৩৮)। এই আয়াতে সেই সব লোকের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, যাদের কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন যে, তারা খোদার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন-যোগ্য হয়ে উঠবে। আর এই সম্মান সবচেয়ে বেশি লাভ করেছেন রসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবীরা (রা.), আর এ জন্য তারা খোদার প্রিয়ভাজন হয়েছেন। স্বীয় সাহাবীদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, তারা তোমাদের পথের দিশারী, তাদের অনুসরণ কর। (মিশকাতুল মাসাবীহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪, কিতাবুল মানাকেব, বাব মানাকেবুস সাহাবা, ফাসলুস সালেস, হাদীস নম্বর, ৬০১৮, প্রকাশনী দারুল কুতুবিল ইলমীয়্যা, বৈরুত ২০০৩ইং)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "তাযকেরাতুল আউলিয়ায় এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ব্যক্তি সহস্র সহস্র রুপিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য করত। আল্লাহ্‌র এক ওলী

মসজিদে এসে জামা'তের সাথে নামায পড়াও আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অন্তর্গত। অতএব, এই রমযানে ওয়াকফে জিন্দেগী, যাদের অঙ্গীকার রয়েছে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়া সবার মাঝে অগ্রগামী হওয়ার জন্য আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করব এবং ওহদাদার বা পদধারী কর্মকর্তা, যাদের প্রতি মানুষের দৃষ্টি রয়েছে আর তাদেরকে তারা নির্বাচনও এজন্যই করে থাকে যে, আমাদের মাঝে তারা সর্বোত্তম, এদের উভয়ের (অর্থাৎ, ওয়াকফে জিন্দেগী ও কর্মকর্তাদের) আদর্শ স্থানীয় হওয়া উচিত।

তাকে দেখেন এবং কাশফী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন যে, এত ব্যাপক আর্থিক-লেনদেন (অর্থাৎ, ব্যবসা করছে, অর্থ আসছে, মানুষকে জিনিসপত্র দিচ্ছেন, বাহ্যত ব্যবসা-বাণিজ্য ও এত অধিক লেনদেন) সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। [ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন ঠিকই, কিন্তু খোদা সম্পর্কে কখনোই উদাসীন হননি। তিনি (আ.) বলেন,] এমন মানুষ সম্পর্কেই আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছেন, অর্থাৎ, কোন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় তাদেরকে খোদা সম্পর্কে উদাসীন করতে পারে না (সূরা আন্‌-নূর: ৩৮)। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এতেই নিহিত যে, সে জাগতিক কাজ-কর্মেও ব্যস্ত থাকবে আবার খোদাকেও ভুলবে না।" তিনি (আ.) বলেন, "সেই টাট্টু ঘোড়া কোন্‌ কাজের, যার উপর বোঝা চাপালেই তা বসে পড়ে আর বোঝা না থাকলে খুব দৌড়ায়। এটি প্রশংসার যোগ্য নয়।"(এক ধরণের ঘোড়াকে টাট্টু বলা হয়, বিশেষ করে যা পাহাড়ী অঞ্চলে বোঝা বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়।) তিনি (আ.) আরো বলেন, "সেই ফকির, যে জাগতিক কাজের ভয়ে নিভৃতে ঘরের কোণে আশ্রয় নেয়, সে এক দুর্বলতা প্রদর্শন করে।"[এদিকটিও সামনে থাকা চাই। ইবাদত অবশ্যই জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু জাগতিক কাজ-কর্মের পাশাপাশি তা করতে হবে। যারা নিভৃতে ঘরের কোণে বসে যায়, ফকিরী বা বৈরাগ্য পন্থা অবলম্বন করে। তিনি (আ.) বলেন, তারা দুর্বলতা প্রর্দশন করে।] "ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই। আমরা কখনো বলি না যে, স্ত্রী-সন্তান পরিত্যাগ কর এবং জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দাও। না, বরং চাকুরি-জীবির উচিত, চাকুরির দায়িত্ব পালন করা এবং ব্যবসায়ীদের উচিত, সুন্দরভাবে ব্যবসা করা। কিন্তু তা করতে হবে ধর্মকে অগ্রগণ্য রেখে। (এটিই হল শর্ত। এর উদাহরণ পৃথিবীতেই বিদ্যমান রয়েছে।) তিনি বলেন, এর উদাহরণ এ পৃথিবীতেই বিদ্যমান। কেননা, এক ব্যবসায়ী এবং চাকুরিজীবি মানুষ তাদের চাকুরি ও ব্যবসার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালনের পরও তাদের স্ত্রী-সন্তান থাকে আর তারা তাদের অধিকার সঠিকভাবে প্রদানও করে। (এক দিকে ব্যবসা এবং চাকুরিও রয়েছে আবার একই সাথে বাড়ি এবং সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব আর স্ত্রীর অধিকারও রয়েছে, তার সবই প্রদান করে থাকে। দুটি বিষয়ই সমান্তরালে চলতে থাকে।" তিনি (আ.) বলেন, "অনুরূপভাবে, এক ব্যক্তি এই সমস্ত ব্যস্ততার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র অধিকারও প্রদান করতে পারে এবং ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে খুব সুন্দরভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। (মলফূযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২০৬-২০৭, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

নামাযের হিফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, অর্থাৎ, নিজেদের নামাযগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কর, বিশেষকরে মধ্যবর্তী বা কেন্দ্রীয় নামাযের আর খোদা তা'লার দরবারে আনুগত্যের সাথে দন্ডায়মান হও (সূরা আল্‌-বাকারা: ২৩৯)। এ আয়াতে বিশেষ করে সেই সব মানুষের দৃষ্টি নামাযের প্রতি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাদের জন্য কোন কোন নামায বোঝাস্বরূপ। রাতে অধিক সময় জাগ্রত থাকার কারণে বা আলস্যের কারণে যদি ফজরের নামাযে অংশ গ্রহণ কঠিন হয় বা সময়মত পড়া কঠিন হয়, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য ফজরের নামায হল 'সালাতুল উসতা'। ব্যবসায়ীর জন্য যদি যোহর বা আসরের নামায পড়া কঠিন হয়, তাহলে এই নামায তার জন্য সালাতে উসতা। হাফিযু শব্দের অর্থ হল, এমনভাবে হিফাযত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, যা কোন জিনিসকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। অনুগত বলে এক মু'মিন তখনইগণ্য হয়, যখন সে এসব নামায যথা সময়ে এবং যথাযথভাবে আদায় করে। এমন নয় যে, তাড়াহুড়া করে এলাম আর মাটিতে কপাল ঠুকে দিয়ে চলে গেলাম।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ তা'লা অঙ্গীকার রক্ষা করার এবং তা মেনে চলার নির্দেশও দিয়েছেন। এতে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং বান্দার সাথে কৃত চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিও অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার হল, আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম-বিষয়ক। মুসলমান হওয়ার কারণে আর বিশেষ করে আমরা আহমদীরা হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার যে অঙ্গীকার করেছি, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার করেছি, ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি আর এ

সমস্ত কথা মেনে চলার যে সব অঙ্গীকার রয়েছে, যা আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করে। এ সবগুলো বিষয়ই বয়আতের শর্তাবলীর অন্তর্গত আর বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এ দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আর তোমরা যখন আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার কর, তখন তা পূর্ণ কর। আর আল্লাহ্‌কে জামিনরূপে গ্রহণ করে কৃত শপথ পাকাপোক্ত করার পর তোমরা তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ (তা) ভাল করেই জানেন (সূরা আন্-নাহল: ৯২)।

অতএব, সুস্পষ্ট নির্দেশ হল, তোমাদের দুটি অঙ্গীকার রয়েছে। একটি হল, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার, যা ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার এবং বয়আতের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকারটি হল, আমি ইসলামভূক্ত হয়ে মুসলমান দাবি করে খোদার সকল নির্দেশ মেনে চলব। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে তা হল, তোমরা পারস্পরিক যে সব চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে থাক, সেগুলোও পূর্ণ কর। যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলছেন, তোমরা যখন আল্লাহ্ তা'লাকে তোমাদের জামিন বানিয়ে নিয়েছ, তখন তোমাদের এ অঙ্গিকার পূর্ণ করা আবশ্যক। এর অর্থ আদৌ এটি নয় যে, যেখানে স্পষ্টরূপে আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে তাঁকে জামিন বানানো হয় না, সেখানে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে কোন সমস্যা নেই, কসম ভঙ্গ করলে কোন অসুবিধা নেই আর চুক্তির শর্ত না মানলেও কিছু যায় আসে না, এমন নয়। বরং তোমাদের করা প্রতিটি অঙ্গীকার ও চুক্তির প্রথম শর্ত হল, সেগুলো যেন ইনসাফ এবং সত্য ও সঠিক মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ইনসাফ এবং সত্য ও সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন তা করবে, তখন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হল, এমনই হওয়া উচিত। কেননা, ইনসাফ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এক মু'মিনের জন্য আবশ্যিক। অন্যভাবে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বা তাঁকে জামিন বানিয়ে আমরা কোন চুক্তি করি বা না করি, তথাপি যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত শিক্ষা হল, ইনসাফ ও সত্যের উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত হও, তাই যে অঙ্গীকার বা চুক্তিই ইনসাফ এবং সত্য ও সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, তা খোদার জামানতেরই অধীনস্থ হবে। কাজেই, এ বিষয়টি বুঝতে হবে যে, একজন মু'মিনকে তার সকল অঙ্গীকার এবং চুক্তি পূর্ণ করতে হবে। আমরা এ কথার গুরুত্ব এবং মাহাত্ম বুঝতে আর অনুধাবন করতে সক্ষম হলে আমাদের সমাজ সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ, প্রতারণা এবং দোষারোপ থেকে মুক্ত হতে পারে। এতে করে পারিবারিক বিষয়ে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেগুলোও সৃষ্টি হতো না। কেননা, এসব ক্ষেত্রেও চুক্তি ভঙ্গ করা হয়ে থাকে। ইদানিং আমি দেখছি, জাগতিক লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে চুক্তি ভঙ্গ করা, প্রতারণা করা, মৌখিক অঙ্গীকার রক্ষা না করার প্রবণতা আমাদের মাঝেও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জামা'তই শুধু কলঙ্কিত হয় না, বরং অনেক সময় এমন মানুষের ঈমানও নষ্ট হয়ে যায়।

মানুষ যখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন সে মিথ্যার আশ্রয় নেয় আর মিথ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কঠোরভাবে সতর্ক করে তা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, অতএব, তোমরা প্রতিমা সমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলা পরিহার কর (সূরা আল্-হাজ্জ: ৩১)।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এখন আমার এই নসীহত করার কোন প্রয়োজন নেই যে, তোমরা খুন করো না (হত্যা করো না, কারো রক্ত ঝড়িও না) কেননা, চরম দুষ্কৃতকারী ছাড়া আর কে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে চাইবে! তাই আমি বলব, অন্যায় হঠকারীতা প্রদর্শন করে সত্যকে পদদলীত করো না। সত্যকে গ্রহণ কর, তা এক বাচ্চার পক্ষ থেকেই হোক না কেন। (কোন শিশুও যদি কোন সত্য কথা বলে, তবে তা গ্রহণ কর আর জেদ করো না) আর বিরোধীর কাছেও যদি সত্য পাও, তবে তাৎক্ষণিকভাবে নিজের অন্তঃসারশূন্য যুক্তি পরিহার কর। (তোমাদের বিরোধী কেউ থাকলে আর সে সত্য বললে অর্থাৎ, ঝগড়া-বিবাদ চলাকালে যদি দেখ যে, দ্বিতীয় পক্ষ সত্য ও সঠিক, তাহলে সেখানে বিতর্ক এবং যুক্তি প্রদর্শনেরও প্রয়োজন নেই, বরং সত্যকে মেনে নাও।) তিনি (আ.) বলেন, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও এবং সত্য সাক্ষ্য দাও, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রতিমার নোংরামী এবং মিথ্যা কথা বলা থেকেও আত্মরক্ষা কর। কেননা, প্রতিমার চেয়ে তা কোন অংশেই কম যায় না। সত্যের কিবলা থেকে তোমাকে যা বিচ্যুত করে, তা তোমার জন্য এক প্রতিমা স্বরূপই। (যা তোমাকে সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে, তা-ই প্রতিমা।) তোমাদের পিতা, ভাই বা বন্ধুদের বিরুদ্ধে হলেও সত্য-সাক্ষ্য দাও। কোন শত্রুতা যেন তোমাকে ইনসাফ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে (সূরা আল্‌হজ্জ: ৩১)।" (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫০)

অ-আহমদীদেরকে তো আমরা পবিত্র কুরআনের এ শিক্ষাই দেখাই আর বলি, 'এটি হল ইনসাফের শিক্ষা।' কিন্তু আমাদের অনেকে এমন আছে, যারা নিজেদের ক্ষেত্রে এ শিক্ষা ভুলে যায়।

আরেক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এই মিথ্যাকে প্রতিমা-পূজার সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। (মিথ্যাকে প্রতিমা পূজার সাথে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে) যেভাবে এক নির্বোধ মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে ছেড়ে প্রতিমার সামনে মাথা নত করে, একইভাবে সত্য ও সততাকে পরিহার করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিথ্যাকে প্রতিমা হিসেবে অবলম্বন করে আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা একে প্রতিমা-পূজার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং এরই সাথে সম্পর্ক যুক্ত করেছেন। যেভাবে প্রতিমার কাছে এক পূজারী মুক্তি যাচনা করে"(অর্থাৎ, প্রতিমা বানিয়ে সেই প্রতিমার কাছে ইবাদতের জন্য যায় এবং ধারণা করে, আমি যদি এর ইবাদত করি বা আমার পাপের জন্য এর কাছে ক্ষমা চাই, তবে আমি মুক্তি লাভ করব বা আমার লক্ষ্য অর্জিত হবে।) তিনি বলেন, "মিথ্যাবাদীও নিজের পক্ষ থেকে এক প্রতিমা বানায় এবং মনে করে, এই প্রতিমার মাধ্যমেই সে মুক্তি পাবে।" (আমি মিথ্যা বললে আমার সমস্যার

সমাধান হয়ে যাবে।) তিনি বলেন, "কত বড় মন্দ-বিষয় এটি! যদি বলা হয় যে, কেন প্রতিমা পূজা করছ? এই নোংরামী পরিহার কর। তারা বলে যে, কিভাবে এটি পরিহার করা যেতে পারে, এ ছাড়া যে কাজই চলে না। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে যে, তারা মনে করে তাদের সমস্ত সাফল্যের ভিত্তি মিথ্যার উপর।

কিন্তু আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, অবশেষে সত্যই সফল হয়। কল্যাণ ও বিজয় তার-ই জন্য অবধারিত। স্মরণ রেখো! মিথ্যার মত অলুক্ষণে আর কিছুই নেই। বস্তুবাদী মানুষ সচরাচর বলে, সত্যবাদীকে গ্রেফতার করা হয়, কিন্তু আমি এ কথা কিভাবে মানতে পারি? আমার বিরুদ্ধে তো ৭টি মামলা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কোন একটি মামলাতেও একটি মিথ্যা শব্দও আমাকে বলতে হয় নি। কেউ আমাকে বলুক, কোন একটিতেও কি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পরাজিত করেছেন? স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা সত্যের সমর্থক এবং সাহায্যকারী। এটি কি হতে পারে যে, তিনি সততার এক পূজারীকে শাস্তি দিবেন! (এটি কিভাবে সম্ভব!) যদি এমন হয়, তাহলে পৃথিবীতে কোন মানুষ সত্য বলার সাহস দেখাবে না।"(সত্যবাদীরা যদি শাস্তি পাওয়া আরম্ভ করে, তাহলে পৃথিবীতে আর কেউই সত্য বলবে না।) তিনি (আ.) বলেন, "খোদার উপর থেকেই বিশ্বাস উঠে যাবে আর সত্য-পূজারীরা জীবন্মৃত হয়ে যাবে।

আসল কথা হল, সত্য বলার ফলে যারা শাস্তি পায়, (সত্য বলার পরও যদি শাস্তি পায়, তবে) তারা তা সত্য বলার কারণে পায় না। বরং তাদের অন্য কোন প্রচ্ছন্ন ও গুপ্ত পাপের কারণে তারা শাস্তি পায় বা অন্য কোন মিথ্যার জন্য শাস্তি পায়। আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাদের পাপ ও দুষ্কৃতির একটি তালিকা রয়েছে, তাদের অনেক ভুল-ভ্রান্তি থেকে থাকে আর সেগুলোর কোন একটির জন্য তারা শাস্তি পায়।(আহমদী অর গায়ের আহমদী ম্যা কিয়া ফারাক হে?, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ.৪৭৮-৪৮০)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনীতভাবে সিজদাবনত হয়ে নিজেদের পাপের জন্য সর্বদা আমাদের ক্ষমা যাচনা করা উচিত, যেন আমরা আমাদের গোপন কোন পাপের জন্য খোদার শাস্তির আওতাধীন হয়ে না যাই।

আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং আল্লাহ্ বর্ণিত মুত্তাকীদের একটি লক্ষণ হল, "ওয়াল কাযিমীনাল গাইযা ওয়াল আফিনা আনিন্ নাস" (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫) অর্থাৎ, ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষকে মার্জনাকারী। আফু শব্দের অর্থ হল, নিজের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে কাউকে ক্ষমা করা। এটিকেই বলা হয় আফু। অতএব, মুত্তাকী কেবল রাগই সংবরণ করে না, বরং ক্ষমা করে। আর ক্ষমাও এভাবে করে যে, যে-ই আমার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, আমি তা ভুলে যাই।

রাগ সংবরণের কী কী উপকারিতা রয়েছে, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো! বিবেক-বুদ্ধি এবং রাগ ও উত্তেজনার মাঝে ভয়াবহ শত্রুতা রয়েছে। উত্তেজনা ও ক্রোধের সময় বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং সহনশীল হয়, তাকে এক জ্যোতি দেয়া হয়, যার ফলে তার বিবেক-বুদ্ধি এবং চিন্তা-শক্তিতে এক নব জ্যোতির উন্মেষ ঘটে। আর এরপর নূর থেকে নূরের সৃষ্টি হয়। আর ক্রোধান্বিত ও উত্তেজনাকর অবস্থায় হৃদয় ও মস্তিষ্ক যেহেতু তমশাচ্ছন্ন থাকে, তাই তমশা বা অন্ধকার থেকে অন্ধকারেরই জন্ম হয়। (মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮০, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

আরেক জায়গায় তিনি বলেন, "স্মরণ রেখো! যে ব্যক্তি কঠোর আচরণ করে এবং অগ্নিশর্মা হয়ে যায়, তার মুখ থেকে প্রজ্ঞা ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ কথা আদৌ নিঃসৃত হতে পারে না। সেই হৃদয়কে প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়, যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে খুব দ্রুত রেগে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সীমার বাইরে চলে যায়। মুখ খারাপকারী এবং লাগামহীন ব্যক্তিকে সূক্ষ্মতার প্রস্রবণ থেকে বঞ্চিত করা হয়।"(যখন গালমন্দ বের হয়, মুখ থেকে নোংরা কথা বের হয়, বিশ্রী শব্দ বের হয় আর এতে কোন বাছ-বিচার থাকে না, তখন এমন মুখ ও ব্যক্তি ভালো, খোদার পছন্দনীয় এবং পুণ্যের কথা হতে বঞ্চিত থাকে আর এমন মানুষ সব সময় নোংরা কথাই বলে থাকে।) তিনি (আ.) বলেন, "ক্রোধ ও প্রজ্ঞা সহাবস্থান করতে পারে না। ক্রোধের কাছে যে পরাস্ত হয়, তার মাথা মোটা এবং বিবেক-বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে থাকে।" (রাগান্বিত হলে বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, তখন মানুষের চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে যায়।) তিনি (আ.) বলেন, "কোন ক্ষেত্রেই তাকে বিজয় এবং সাহায্য প্রদান করা হয় না। ক্রোধ হল অর্ধ-উন্মাদনা আর এটি যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন তা পুরো উন্মাদনায় পর্যবসিত হয়। [আল হাকাম, তারিখ ১০ মার্চ ১৯০৩,পৃ.৮, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা ৯, উদ্ধৃত– তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ২য় খণ্ড, পৃ.১৫৩]

অতঃপর আরেক জায়গায় তিনি বলেন, "পুরুষের উচিত, যথাযথ ও বৈধ স্থানে স্বীয় শক্তি নিচয়ের ব্যবহার করা। যেমন, ক্রোধশক্তি, এটি যখন মাত্রা অতিক্রম করে, তখন তা উন্মাদনার পূর্ব লক্ষণ হয়ে থাকে। উন্মাদনা এবং এর মাঝে পার্থক্য খুবই সামান্য। (রাগ এবং উন্মাদনা বা পাগলামীর মাঝে পার্থক্য খুবই অল্প।) চরম রাগী ব্যক্তির কাছ থেকে প্রজ্ঞার প্রস্রবণ কেড়ে নেয়া হয়। কাজেই, কোন বিরোধীর সাথেও অগ্নিশর্মা হয়ে কথা বলবে না। (মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

কেউ বিরোধী হলেও তার সাথে তোমার রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কথা বলা উচিত নয়, বরং তখনো প্রজ্ঞার সাথে কথা বলা উচিত। অতএব, খোদার আদেশ-নিষেধ পালন করা আমাদের চরিত্রকে উন্নত করে তাঁর নৈকট্য দানের পাশাপাশি আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকেও শাণিত করে তুলে। আর এর মাধ্যমে মানুষ নানা রকম শত্রুতা এবং ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। রগচটা এবং ঝগড়াটে অধিকাংশ মানুষকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা গিয়েছে, তারা কখনো লাভবান হয় নি।

আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং আল্লাহ্ বর্ণিত মুত্তাকীদের একটি লক্ষণ হল, "ওয়াল কাযিমীনাল গাইযা ওয়াল আফিনা আনিন্ নাস" (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫) অর্থাৎ, ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষকে মার্জনাকারী। আফু শব্দের অর্থ হল, নিজের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ সম্পূর্নরূপে ভুলে গিয়ে কাউকে ক্ষমা করা। এটিকেই বলা হয় আফু। অত এব, মুত্তাকী কেবল রাগই সংবরন করে না, বরং ক্ষমা করে। আর ক্ষমাও এভাবে করে যে, যে-ই আমার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, আমি তা ভুলে যাই।

এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "দুটো শক্তি মানুষকে উন্মাদ বানিয়ে ছাড়ে। (অর্থাৎ, উন্মত্ত বানিয়ে দেয়। সেগুলো কোন্ দুটো শক্তি?) একটি হল কুধারণা, আর অপরটি হল ক্রোধ, যখন এগুলো সীমাতিক্রম করে। (অর্থাৎ, যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন মানুষকে তা উন্মাদ বানিয়ে ছাড়ে।) কাজেই, মানুষের জন্য কুধারণা ও রাগ পরিহার করা একান্ত আবশ্যক। (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৪, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কুধারণা এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কুধারণা এড়িয়ে চলার বিষয়ে অনেক বেশি সচেষ্ট থাক। কেননা, কিছু কিছু সন্দেহ পোষণ অবশ্যই পাপ হয়ে থাকে। আর (কারো বিরুদ্ধে) গোয়েন্দাগিরি করো না এবং একে অন্যের গীবত বা কুৎসা করো না। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা এটিকে চরমভাবে ঘৃণা করে থাক। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশি তওবা গ্রহণকারী এবং বার বার কৃপাকারী (সূরা আল্-হুজুরাত: ১৩)।

এই আয়াতে প্রথম যে বিষয়টি পরিহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা হল কুধারণা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কুধারণা এমন একটি ব্যাধি ও ভয়ঙ্কর বিপদ, যা মানুষকে অন্ধ করে ধ্বংসের অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে নিক্ষেপ করে। (মলফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

এরপর তিনি বলেন, "খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো! সকল পাপ এবং মন্দ বিষয় কুধারণা থেকেই সৃষ্টি হয়। তাই, আল্লাহ্ তা'লা এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ বিশেষভাবে দিয়েছেন।" তিনি বলেন, " কুধারণা এড়িয়ে চলার জন্য মানুষের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। কারো সম্পর্কে হৃদয়ে কোন মন্দ ধারণা সৃষ্টি হলে (কোন বাজে ও কুধারণা সৃষ্টি হলে) অজস্র ধারায় ইস্তেগফার কর। (মনের মাঝে অন্য কারো সম্বন্ধে কুধারণার উদ্রেক হলে একে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে, এ বিষয়ে চিন্তা না করে বা এ জন্য কারো ক্ষতি সাধনের পরিবর্তে অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত যে, অন্যের সম্পর্কে কুধারণার উদ্রেক হয়েছে) তিনি (আ.) বলেন, "অধিক হারে ইস্তেগফার কর এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া কর, যেন সেই পাপ এবং এর অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা পাও, (যেন এই পাপ থেকে বাঁচা যায় এবং এই পাপের ফলে সৃষ্ট কুফল থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।) যা এই কুধারণার ফলাফল হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে। একে সামান্য কোন বিষয় মনে করা উচিত নয়, এটি খুবই ভয়ঙ্কর একটি ব্যাধি।" (মলফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭১-৩৭২, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

এরপর এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা দ্বিতীয় যে বিষয়টি করতে আমাদের বারণ করেছেন তা হল, ছিদ্রান্বেষণ বা গোয়েন্দাগিরি করা। খুটে খুটে অন্যের দোষ বের করা বা কোন বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করা। মানুষ যা বলতে চায় না, সে বিষয়ে মহা আগ্রহের সাথে চেষ্টা করা, যেন আমি তা জানতে পারি। এটি অন্যায়, এ থেকেও মন্দ বিষয়ের সৃষ্টি হয়।

আর তৃতীয় নির্দেশ হল, তোমরা পরচর্চা করবে না। পরচর্চা নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার নামান্তর আর তোমরা এটি চরমভাবে ঘৃণা করবে। মহানবী (সা.)-কে গীবত বা পরচর্চা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সা.) বলেন, কারো সম্পর্কে কোন সত্য কথা তার অবর্তমানে এমনভাবে বর্ণনা করা যে, উপস্থিত থাকলে সে তা অপছন্দ করবে, এটিই গীবত।কারো অবর্তমানে তার সম্পর্কে কথা বলা আর তা সত্য হলেও সে কথা যদি তার কাছে খারাপ লাগে তবে তা গীবত। আর তাতে যদি বর্ণিত সে বিষয়টি না থাকে, তবে সেটি অপবাদ। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাব তাহরীমুল গীবাত, হাদীস নম্বর ৬৫৯৩)

অতএব, মুত্তাকীর এমন কথা বলা শোভা পায় না, যা বললে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই, পরচর্চাও করবে না আর অপবাদও লাগাবে না।

অতএব, রমযান মাসে যেখানে আমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে চাই, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে চাই এবং আমাদের দোয়াগুলোকে কবুল বা গৃহীত হতে দেখতে চাই, সেখানে আমাদের

এসব পাপ থেকে মুক্ত থাকার এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলার সমূহ-চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন তাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারি এবং রমযানের পরেও যেন আমাদের মাঝে এসব পূণ্য বিদ্যমান থাকে। আর আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ইবাদতকারী ও পূর্ণ আনুগত্যকারী বান্দা হতে পারি।

নামাযের পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি একজন শহীদের জানাযা। জনাব চৌধুরী খালীক আহমদ সাহেব, পিতা চৌধুরী বশীর আহমদ সাহেব, তিনি করাচির গুলজার হিজরীর অধিবাসী। ২০১৬ সনের ৩০ জুন তারিখে ৪৯ বছর বয়সে রাত প্রায় ৯.৩০ মিনিটে জামা'তের বিরোধীরা তার ক্লিনিকে ঢুকে তাকে গুলি করে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাহি ইলাইহি রাজিউন।

সংবাদ অনুসারে চৌধুরী খালীক আহমদ সাহেব মেডিক্যাল ডিপ্লোমা করেছেন আর নিজের বাড়ির কাছেই এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক খুলে রেখেছিলেন। ঘটনার দিন তিনি রীতি অনুসারে ইফতারী করার পর গুলজার হিজরীতে অবস্থিত ক্লিনিকে ফিরে আসেন এবং সেখানে অবস্থান করা রোগীদের দেখছিলেন। রাত প্রায় সাড়ে নয়টার দিকে হেলমেট পরিহিত দুই অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি ক্লিনিকে এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দুটি গুলি তার মাথায় লাগে আর দুটি লাগে বুকে। ক্লিনিকের পাশে অবস্থিত মেডিক্যাল স্টোরের মালিক তাৎক্ষণিক ভাবে মোটর সাইকেলে করে তার বাড়িতে গিয়ে সংবাদ দেয়। তার ছেলে গাড়ী নিয়ে আসে, গাড়ীতে করে তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছার পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাহি ইলাইহি রাজিউন। করাচীর এই হালকা গুলজার হিজরীতেই গত মে মাসের ২৫ তারিখে অজ্ঞাত-পরিচয় এক ব্যক্তি গুলি করে জনাব দাউদ আহমদ সাহেবকেও শহীদ করে।

শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াত আসে তার দাদা অমৃতসরের অধিবাসী আল্লাবক্স সাহেবের মাধ্যমে। তার পরিবার অমৃতসর থেকে গোখোয়াল এবং রহিম ইয়ার খানে এসে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে তারা সাংঘর জেলার শেহ্‌দাদপুরে স্থানান্তরিত হন। মরহুম ১৯৬৭ সনে সাংঘর জেলার শেহ্‌দাদপুরের নিকটবর্তী আহমদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

এরপর ১৯৮৮ সনে করাচীতে স্থানান্তরীত হন। এখানে মেডিক্যাল ডিপ্লোমা করেন এবং পরে একটি প্রাইভেট ল্যাবরেটরীতে রেডিও গ্রাফিক টেকনেশিয়ান হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। একই সাথে তিনি সন্ধ্যার সময় নিজের ক্লিনিকে প্র্যাকটিস করাও আরম্ভ করেন। পরে ল্যাবরেটরির চাকুরি ছেড়ে সার্বক্ষণিকভাবে জন্য মেডিক্যাল ক্লিনিকে বসা আরম্ভ করেন। শহীদ মরহুম বহুগুণের আধার ছিলেন। তবলীগের জন্য গভীর প্রেরণা ছিল। ক্লিনিকেও তিনি অ-আহমদীদেরকে তবলীগ করতেন। শহীদ মরহুম বাজামা'ত নামায এবং নফল ইবাদতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি খুবই দরদি মানুষ ছিলেন। অভাবীদেরকে তিনি ফি ছাড়াই চিকিৎসা করতেন।

অ-আহমদী কিছু রোগী বলত যে, আপনি কাদিয়ানী, তাই আপনার কাছ থেকে ঔষধ নিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু আপনার ঔষধেই যে সন্তানরা আরোগ্য লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মুসী ছিলেন আর জামা'তী কাজেও তিনি অগ্রগামী থাকতেন। শহীদ মরহুম তার হালকায় মোহাস্‌সেল এবং আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম হিসেবে খিদমতের তৌফিক পেয়েছেন। একই সাথে তিনি গত ১৮ বছর ধরে উক্ত হালকার সেক্রেটারী ওয়াকফে নও হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তার স্ত্রী বলেন এবং ছেলেমেয়েরাও লিখেছে যে, স্বল্প বয়সেই তিনি তাদেরকে নামাজে অভ্যস্ত করেছেন এবং তিনি নিজেও নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায যথাসময়ে পৃথক পৃথক ভাবে পড়তেন। প্রতিদিন অনুবাদসহ কুরআন পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। যুগ-খলীফার খুতবা তিনি নিজেও নিয়মিত শুনতেন এবং সন্তানদেরকেও সব সময় শোনাতেন, বরং অবশ্যই সকাল-সন্ধ্যা এম.টি.এ. চালাতেন। ঘরে যদি তরবীয়ত করতে হয়, তাহলে এম.টি.এ.-ই তরবীয়তের সর্বোত্তম মাধ্যম। গ্রামের লোকদের প্রয়োজনে তিনি তাদের পাশে দাঁড়াতেন।

শহীদ মরহুমের স্ত্রী বলেন, প্রায় একমাস পূর্বে স্বপ্নে আমি শরবতে ভরা দুটি গ্লাস দেখি। আমি প্রশ্ন করি, কিসের শরবত, বিশেষ কোন শরবত মনে হচ্ছে? তখন স্বপ্নে আমাকে জানানো হয়, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো জিনিসের শরবত। শহীদ মরহুমের শাহাদতের পর বুঝতে পেরেছি, এটি শাহাদাতের অমৃত-সুধা। ইতিপূর্বে জনাব দাউদ আহমদ সাহেব শহীদ হন আর তিনিও একই গলীতে বসবাস করতেন। কয়েক দিন পূর্বেই তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। দুটি গ্লাস বলতে হয়তো এ দুটি শাহাদাতকেই বুঝায়।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে মরহুমের ভাই, বোন ছাড়াও স্ত্রী বুশরা খালীক সাহেবা এবং দুই ছেলে আছেন। এদের একজন স্নেহের অনিক আহমদ, সে জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়ায় অধ্যয়নরত এবং আরেক পুত্র রহিক আহমদ, সে পি.টি.এস.-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। এছাড়া এক কন্যা স্নেহের সামায়েলা আহমদ, যার বয়স ১৬ বছর, এদেরকে তিনি রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং মনোবল দিন, আর পিতার পূণ্য যেন তার সন্তান-সন্ততির মাঝে সর্বদা বিরাজমান থাকে। (আমীন)

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ জুলাই থেকে ২১ জুলাই, ২০১৬)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

জুমুআর খুতবা

আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পথ

কানাডার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, মিসিসাওগায় সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত ০৭ অক্টোবর, ২০১৬ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ থেকে জামা'তে আহমদীয়া কানাডার জলসা সালানা শুরু হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে প্রতি বছরই সারা পৃথিবীর জামা'তসমূহ নিজ নিজ দেশে জলসার আয়োজন করে থাকে। কিন্তু কেন করে? এর কারণ হল, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতি পেয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে এই জলসার সূচনা করেছিলেন। (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬১১)

আর তিনি (আ.) বলেছেন, বছরে তিন দিন তোমরা কাদিয়ানে সমবেত হও। সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আমরা কোন মেলার আয়োজন করব, আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা করব অথবা পার্থিব কোন উদ্দেশ্য সাধন করব। বরং ধর্মীয়-জ্ঞান বৃদ্ধি ও এর ব্যাপক বিস্তৃতি এবং মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের উদ্দেশ্যে সমবেত হও। (আসমানীফায়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫১-৩৫২)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ থেকে জামা'তে আহমদীয়া কানাডার জলসা সালানা শুরু হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে প্রতি বছরই সারা পৃথিবীর জামা'তসমূহ নিজ নিজ দেশের জলসা আয়োজন করে থাকে। কিন্তু কেন করে? এর কারন হল, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতি পেয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে এই জলসার সূচনা করেছিলেন।

মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান বলতে কী বুঝায়? কোন বিষয় জানা এবং এর অন্তর্নিহিত গভীরতার ব্যুৎপত্তি লাভ করাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। কোন্ 'মারেফাত'-এ তিনি (আ.) উন্নতি করাতে চেয়েছিলেন? তিনি চেয়েছিলেন, শুধু বাহ্যিকভাবেই যেন এ কথার বহিঃপ্রকাশ না ঘটে যে, আমরা মুসলমান বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' কলেমার পাঠকারী, বরং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আমরা যেন ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করি। তিনি বলেন, তোমরা যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' পাঠ করে থাক, তাহলে জানার চেষ্টা কর যে, আল্লাহ্ তা'লা কে, আর তিনি আমাদের কাছে কী চান? আল্লাহ্ তা'লার অধিকার কী কী, আর আমাদেরকে তা কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে? খোদার নির্দেশাবলীকে কিভাবে বুঝতে হবে আর কিভাবে সেগুলোর উপর আমল করতে হবে? হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমরা আল্লাহ্ তা'লার রসূল হিসেবে মেনেছি, তাঁকে খাতামুল আম্বিয়া মেনেছি, তাই তাঁর আদেশ-নিষেধ, তাঁর শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনের রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং এর উপর আমল করার উপায়ও অন্বেষণ করতে হবে।(মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৩, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

এখন প্রশ্ন হল, মহানবী (আ.)-এর জীবন-চরিত কেমন ছিল? এ সম্পর্কিত তত্ত্বজ্ঞান কিভাবে লাভ হবে? এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) প্রদত্ত সেই উত্তরের মাঝেই সবকিছু নিহিত আছে, যা এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি(রা.) বলেছিলেন। সে মহানবী (সা.)-এর জীবন এবং সীরাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে হয়রত আয়েশা (রা.) উত্তরে বলেন, তুমি কি কুরআন পাঠ কর নি? অতএব, পবিত্র কুরআন যা কিছু বলে, তা-ই মহানবী (সা.)-এর জীবনাচার এবং তাঁর প্রতিটি আমলের বিশদ বর্ণনা। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪-১৪৫, মুসনাদ আয়েশা, হাদীস নম্বর ২৫১০৮, মুদ্রণ- আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮ইং)

অতএব, মহানবী (সা.) সম্পর্কে এটিই হল সেই মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের কথা, যা অর্জনের জন্য এক মু'মিনকে সাধনায় রত থাকা উচিত। এ জন্য কুরআন শরীফ পাঠ করা এবং তা অনুধাবন করাও আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, জলসার উদ্দেশ্য হল, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা। মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর তা যেন কেবল জ্ঞান আহরণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং একে আধ্যাত্মিকতা এবং আমলের ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যম বানাতে হবে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যদি উন্নতি না হয়, তাহলে জলসায় অংশগ্রহণ অর্থহীন সাব্যস্ত হয়। তিনি (আ.) আরো বলেন, জলসার যে উপকারিতা লাভের জন্য জলসায় আগত প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত, তা হল পারস্পরিক পরিচিতি বৃদ্ধি পাওয়া। কিন্তু এই পরিচয় যেন বস্তুবাদী মানুষের মতো কেবল সাময়িক পরিচয় না হয়, বরং প্রত্যেক আহমদীর উচিত, অন্য সব আহমদীর সাথে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো দৃঢ়তর করা। আর এই বন্ধন এতটা দৃঢ় ও অটুট হবে যে, এ সম্পর্কের মাঝে কোন কিছুই চির ধরাতে পারবে না এবং একে ছিন্ন করতে পারবে না। (আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫২)

তিনি (আ.) আরো বলেন, তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি কর। (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪)

এটি জলসার উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য। এটি ছাড়া একজন মু'মিন প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না। আর তাকওয়া হল– জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার যে মান অর্জন করেছ, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের সাথে ভালোবাসার যে বন্ধন গড়েছ আর পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছ, তাতে এখন স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা কর। আর এতে ক্রমোন্নতির ধারা বজায় রেখে নিজেদের জীবনের স্থায়ী-অংশে পরিণত কর।

অতএব, এ বিষয়গুলো অর্জনের জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার সূচনা করেন এবং বলেন, এ সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ যেন প্রতি বছরই কাদিয়ানে আগমন করে। সে সব জলসা কতই-না কল্যাণময় হতো, যেগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে যোগ দিতেন এবং জামা'তকে সরাসরি নসীহত করতেন আর জামা'তের সদস্যদের তরবীয়ত করতেন ও তাদের আধ্যাত্মিক-পিপাসা নিবারণ করতেন। তিনি (আ.)-এর তিরোধানের পর সে বিষয়গুলো তো আর তেমন হতে পারে না। কেননা, স্বীয় বিশেষত্বই নবীর মর্যাদা হয়ে থাকে। আর যিনি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আগমন করেছেন এবং যাকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে ধর্মকে

সঞ্জীবিত করার জন্য প্রেরণ করেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এটিও আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি (আ.) খোদা প্রদত্ত সংবাদের ভিত্তিতে বলেছেন, তার তিরোধানের পর 'কুদরতে সানীয়া'র নেযাম অর্থাৎ, খিলাফত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব, সেই খিলাফত ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে এবং এই খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে তার (আ.) মিশন সফলভাবে বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। জলসার ব্যবস্থাও এই ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর যখন খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন খিলাফতের অধীনে প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত কাদিয়ানে জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এরপর পাকিস্তানে খিলাফতের হিজরতের কারণে রাবওয়াতে জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আর একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জামা'তের বিস্তৃতি এবং প্রসার ঘটতে থাকে। যদিও কাদিয়ান থেকে হিজরতের পূর্বেই বহির্বিশ্বে জামা'তের মিশন কায়েম হওয়া আরম্ভ হয়েছিল, বিশেষ করে আফ্রিকায় খুব মজবুত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুরু হয়েছিল, তথাপি পাকিস্তানের বাহিরের জামা'তগুলোতে আগত প্রতিটি দিন, মাস ও বছরেই সমধিক দৃঢ়তা ও বিস্তৃতি লাভ হতে থাকে। এমনকি জামা'তের এই উন্নতি দেখে শত্রুরা সরকারকে দিয়ে আহমদীদের বিরুদ্ধে চরম নিষ্পেষণ মূলক আইন প্রণয়ন করায়, যার কারণে যুগ খলীফাকে সেখান থেকে হিজরত করতে হয় আর একই সাথে আহমদীদের একটি বড় সংখ্যাও সেখান থেকে হিজরত করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর লন্ডনে হিজরতের পর লন্ডনের জলসাগুলো যেখানে নতুন মোড় নিয়েছে এবং ব্যাপকতা লাভ করেছে, সেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও জলসা এক নবরূপ ধারণ করেছে আর প্রতিদিনই এ ক্ষেত্রে উন্নতির উর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বের সর্বত্রই আজ জলসার এক নতুন চিত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এখন এটি সম্ভব নয় যে, আহমদীদের একটি বড় সংখ্যা জলসার জন্য কাদিয়ান যাবে আর এটিও সম্ভব নয় যে, যুগ খলীফা যেখানে রয়েছেন, আহমদীদের এক বড় সংখ্যা সেখানকার জলসায় অংশ নেবে। পৃথিবীতে জামা'ত যেভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে এবং উন্নতি করছে, তার সাথে সঙ্গতি রেখে যেখানে জামা'ত রয়েছে এমন প্রতিটি দেশে সেভাবেই জলসার আয়োজন করা আবশ্যক ছিল, যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে অনুষ্ঠিত হতো। নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের জন্য বছরে কমপক্ষে একবার তরবিয়তের উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) আমাদেরকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতএব, আপনারাও আজ এখানে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই সমবেত হয়েছেন, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন। প্রতি বছর আপনারা এই উদ্দেশ্যেই একত্রিত হন। আর এবছর আপনাদের একত্রিত হওয়ার বিশেষ কারণ হল, এখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে। অনেকের হয়তো এ বিষয়ে ভিন্ন মত থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু কোন না কোন মান নির্ধারণ করতে হয়, তাই যখন থেকে জামা'তের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, সেটিকে মান হিসেবে নির্ধারণ করে ৫০ বছর গণনা করা হয়। নতুবা বলা হয়ে থাকে যে, সম্ভবত ১৯১৯ সালেই একজন আহমদী প্রথম এখানে এসেছিলেন। যাহোক, এই দেশে জামা'ত এ বছর তাদের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করছে আর এ কারণেই আমীর সাহেব বিশেষভাবে আমাকে এখানে আসার জন্য জোরালো অনুরোধ করেছেন এবং বলেছেন, ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কানাডা জামা'ত এ বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, এই জলসাও বেশ বড় জলসা হবে, তাই আপনি আসুন। আমি যেভাবে বলেছি, যুগ-খলীফার

এখন এটি সম্ভব নয় যে, আহমদীদের একটি বড় সংখ্যা জলসার জন্য কাদিয়ান যাবে আর এটিও সম্ভব নয় যে, যুগ খলীফা যেখানে রয়েছেন, আহমদীদের এক বড় সংখ্যা সেখানকার জলসায় অংশ নেবে। পৃথিবীতে জামা'ত যেভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে এবং উন্নতি করছে, তার সাথে সঙ্গতি রেখে যেখানে জামা'ত রয়েছে এমন প্রতিটি দেশে সেভাবেই জলসার আয়োজন করা আবশ্যক ছিল, যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে অনুষ্ঠিত হতো। নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের জন্য বছরে কমপক্ষে একবার তরবিয়তের উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) আমাদেরকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উপস্থিতিতে জনসমাগমও বেশি হয় আর এ বছর এ কারণে, অর্থাৎ- আমার আগমনের কারণে বহির্বিশ্ব থেকেও অনেকেই এসে থাকবেন আর হয়তো এসেছেনও।

যাহোক, এই বছরটিকে আপনারা, অর্থাৎ- এখানে বসবাসকারী আহমদীরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, এর গুরুত্ব বাস্তবে পরিলক্ষিত হবে তখন, যখন কানাডায় বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী এই প্রচেষ্টা করবে যে, আহমদী হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমরা যে বয়আতের অঙ্গীকার করেছি, সেটিকে আমাদের পূর্ণ করতে হবে, তিনি (আ.) আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা করেছেন, তা পূরণ করতে হবে। নতুবা ৫০ বছর হোক বা এর চেয়ে বেশি হোক, তাতে কি-ই বা আসে যায়।

আমি যেভাবে বলেছি, পাকিস্তানের অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনেক আহমদী পাকিস্তান থেকে অন্যান্য দেশে হিজরত করেছেন। আর আপনাদেরও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি এই হিজরতের কারণেই এখানে এসেছেন। ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য আপনারা হিজরত করেছেন এবং এই দেশের সরকার আপনাদেরকে এখানকার নাগরিকত্ব এজন্য দিয়েছে যে, আপনারা যেন স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয়-শিক্ষার উপর আমল করতে পারেন। অতএব, 'আমি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব', (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)- এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার পাশাপাশি এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর অনেক বড় একটি দায়িত্ব হল, যে উদ্দেশ্যে হিজরত করেছেন, তা অর্জনের চেষ্টা করা। আপনারা নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অবহিত করুন যে, এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা পাকিস্তান থেকে বের হয়ে এসেছি। আর এখানে এসে আপনাদের অবস্থার উন্নতি এটি দাবি করে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে আমরা যেন তাঁর নির্দেশাবলীর উপর আমল করি, বয়আতের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমরা যে ওয়াদা করেছি,তা যেন পূর্ণ করি। যার মাঝে একটি হল, আমি কুরআন করীমের অনুশাসনকে শতভাগ শিরোধার্য করব। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৪)

বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে সব কথা এবং আদেশ-নিষেধ আমাদের সামনে সুন্দর ও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন, সেগুলোর প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর কথা এবং বাণীকে তিনি (আ.)-এর চেয়ে উত্তমরূপে আর কেউ বুঝতে পারে নি। তিনি (আ.) যেভাবে পথ-নির্দেশনা দান করেছেন,তা অবলম্বন করে ধর্মীয় শিক্ষা এবং আল্লাহ্ তা'লার বাণী গভীরভাবে অনুধাবনের মাধ্যমে আমরা আমাদের মন-মস্তিষ্ককে আলোকিত আর ঈমানকে দৃঢ় করতে পারি।

এ প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে অগণিত নসীহত করেছেন, যা জ্ঞান আহরণ ও কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা লাভের জন্য আবশ্যক। আমাদের বয়আত গ্রহণের পর তিনি (আ.) আমাদের মাঝে এক উন্নতমান দেখতে চেয়েছেন। জলসার উদ্দেশ্য হল, সেই মান অর্জনের চেষ্টা করা। অতএব, প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা এ কথাটি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এখন হয়তোবা অনেকেই এমন হবেন, যারা জলসায় তো এসেছেন কিন্তু পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনছেন না অথবা অনেকে হয়তো সফরের কারণে ক্লান্তও হবেন এবং তন্দ্রাও পাচ্ছে, তাদের সবাইকে আমি বলছি, আমি যে সব কথা বর্ণনা করছি, এগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন আর পূর্ণ সচেতনতার সাথে বসার চেষ্টা করুন। আধা ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট সময় এমন কোন বিষয় নয়, যা মানুষের জন্য অসহ্য হবে। আর জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হবে, যখন আপনারা এই কথা গুলোও শুনবেন, যা আমি বলছি এবং সেই সমস্ত কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আর তার উপর আমল করার চেষ্টা করবেন, যা অন্যান্য বক্তারা তাদের বক্তৃতায় বর্ণনা করবেন। অনেক কথা এমন হয়ে থাকে, যা ঈমানী ও আধ্যাত্মিক-উন্নতির কারণ হয়। আর শুধু জয়োধ্বনি উচ্চারিত করে সাময়িকভাবে আনন্দিত হবেন না, বরং সেগুলোকে জীবনের স্থায়ী-অংশ করে নিন।

যেভাবে আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় কয়েকটি কথা বর্ণনা করব, যেন তাঁর বাণী সরাসরি কর্ণগোচর হয় এবং মন-মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে আর সেই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন। এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি আমার এ জামা'তকে বারংবার বলেছি যে, তোমরা শুধু এই বয়আতের উপরই নির্ভর করো না। এর অন্তর্নিহিত বাস্তবতা উপলব্ধি না করা পর্যন্ত তোমাদের মুক্তি লাভ হবে না।" তিনি বলেন, "খোসা পেয়ে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে যায়, সে শাঁস লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকে।" অর্থাৎ, তোমরা যদি কেবল এতেই সন্তুষ্ট থাক যে, আমি ফলের খোসা পেয়ে গেছি, তাহলে এটি কোন উপকারী জিনিস নয়। আসল ফল থেকে তুমি বঞ্চিত থেকে যাবে। বুদ্ধিমান সে, যে খোসা নয় বরং ফলের শাঁস লাভের চেষ্টা করে।

তিনি আরো বলেন, "শিষ্য যদি আমল বা কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে পীরের বুযুর্গী তার কোন উপকারেই আসে না।" অর্থাৎ, বয়আত গ্রহণের পর যদি নিজের আমল বা ব্যবহারিক-অবস্থার সংশোধন না কর আর শুধু এতেই আনন্দিত থাক যে, যাকে আমি মান্য করেছি, তিনি আল্লাহ্ প্রেরীত মহাপুরুষ, তাহলে কোন লাভ হবে না। আল্লাহ্ প্রেরীত ব্যক্তির বুযুর্গী স্বীয় অবস্থানে অবশ্যই সঠিক ও সত্য, কিন্তু মান্যকারী সেই পুণ্য বা বুযুর্গী থেকে তখনই লাভবান হবে, যখন তার নিজের আমল বা কর্মও সেই বুযুর্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তার কথা অনুযায়ী হবে। তিনি বলেন, "কোন চিকিৎসক কাউকে ব্যবস্থাপত্র দিলে সে যদি সেই ব্যবস্থাপত্র তাকে তুলে রাখে, তাহলে তার আদৌ কোন লাভ হবে না। কেননা, ব্যবস্থাপত্রে লেখা নিদের্শনা পালনের মাধ্যমেই উপকারিতা পাওয়া যায়।" যে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে, সে অনুযায়ী ঔষধ

যাহোক, এই বছরটিকে আপনারা অর্থাৎ, এখানকার বসবাসকারী আহমদীরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু, প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, এর গুরুত্ব বাস্তবে পরিলক্ষিত হবে তখন, যখন কানাডায় বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী এই প্রচেষ্টা করবে যে, আহমদী হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমরা যে বয়আতের অঙ্গীকার করেছি, সেটিকে আমাদের পূর্ণ করতে হবে, তিনি (আ.) আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা করেছেন, তা পূরণ করতে হবে। নতুবা ৫০ বছর হোক বা এর চেয়ে বেশি হোক, তাতে কি-ইবা আসে যায়।

প্রস্তুত কর বা সেই ঔষধ ক্রয় কর এবং তা সেবন কর, তবেই উপকার পাবে। তিনি বলেন, "যা থেকে সে নিজেই বঞ্চিত।" অর্থাৎ, ব্যবস্থাপত্র তো নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কাজে না লাগিয়ে, তা ব্যবহার না করে নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করেছে। তিনি বলেন, "কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকটি তোমরা বারবার পাঠ কর এবং এর শিক্ষা অনুসারে নিজেকে গড়ে তোল।" এরপর বলেন, "কাদ আফলাহা মান যাক্কাহা"(সূরা আশ্-শামস: ১০)। অর্থাৎ, নিশ্চয় সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে তাকওয়ায় উন্নতি করেছে। তিনি বলেন, "এমনিতে তো শত-সহস্র চোর, ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপ এবং দুর্নীতি-পরায়ন ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর উম্মত হওয়ার দাবি করে, কিন্তু প্রশ্ন হল,তারা কি আসলেই এমন? কখনোই নয়। সে-ই প্রকৃত উম্মত, যে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার উপর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩২-২৩৩, সংস্করণ, ১৯৮৫ ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

বয়আতের মান সম্পর্কে এক উপলক্ষ্যে আরো বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, "অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি বয়আত এবং ঈমানের দাবি করে, তার যাচাই করে দেখা উচিত, আমি কি শুধুই খোসা, নাকি আমার মাঝে শাঁসও রয়েছে? শাঁস সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ঈমান, ভালোবাসা, আনুগত্য, বয়আত, বিশ্বাস, শিষ্যত্ব এবং মুসলমান হওয়ার দাবি সত্য ও সঠিক দাবি নয়। স্মরণ রেখো! এটি সত্যি কথা যে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে শাঁস ব্যতিত খোসার কোন মূল্যই নেই। ভালোভাবে স্মরণ রেখো! মৃত্যু যে কখন আসবে, তা কেউ জানে না। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, মৃত্যু অবশ্যই আসবে। অতএব, নিছক দাবির উপরই নির্ভর করো না আর আনন্দিত হয়ো না। এটি আদৌ কোন কল্যাণকর বিষয় নয়। মানুষ যতক্ষণ নিজের উপর বহু-মাত্রিক মৃত্যু আনয়ন না করবে এবং বহু মাত্রায় পরিবর্তন ও বিপ্লব সাধন না করবে, ততক্ষণ সে মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে না। (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

এই মৃত্যু কী? এটি হল ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়া। পৃথিবীর চাকচিক্য আমাদের সামনে রয়েছে। বিশেষতঃ এসব দেশে, আল্লাহ্ তা'লার পথ থেকে বিচ্যুত করার প্রচেষ্টায় প্রতিটি পদক্ষেপে বিভিন্ন জাগতিক-ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

পুনরায় তিনি বলেন, "পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা দেখ! আমাদের প্রিয় নবী (সা.) নিজের আমল দ্বারা এটি দেখিয়েছেন যে, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহ্ তা'লার জন্য। পৃথিবীতে আজ মুসলমান রয়েছে, কিন্তু তাদের কাউকে যদি বলা হয়, তুমি কি মুসলমান? তাহলে সে বলে, আলহামদুলিল্লাহ্। যার কলেমা তারা পাঠ করে, তাঁর জীবনের মূলনীতি ছিল- সব কিছুই হল খোদার সন্তুষ্টির জন্য, অথচ এদের জীবন ও মৃত্যু সব ইহজগতের জন্য হয়ে থাকে, যতক্ষণ না মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয় (অর্থাৎ, যখন জীবনের শেষ সময় উপস্থিত হয়ে প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার উপক্রম হয়)। তিনি বলেন, "খ্যাতি ও প্রসার পেয়েই আত্মপ্রসাদ নেয়া বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ নয়। কোন ইহুদীকে এক মুসলমান বলে, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। সে উত্তরে বলে, শুধু নাম নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট হয়ো না (যে, তুমি মুসলমান। সেই ইহুদি তাকে বলে,) "আমি আমার ছেলের নাম খালেদ রেখেছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই তাকে দাফন করে এসেছি।" খালেদ নাম রাখার কারণেই সে দীর্ঘায়ু পায় নি, তার জীবন দীর্ঘ হয় নি। সে বলে, হতভাগা শিশুটি সন্ধ্যার সময়ই মারা গিয়েছে আর আমি তাকে দাফন করে এসেছি।

তিনি (আ.) বলেন, "অতএব,সত্য ও বাস্তবতার সন্ধান কর। শুধু নাম নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যেও না। কতই-না লজ্জার কথা যে, মহানবী (সা.)-এর উম্মত হওয়ার দাবি করার পর মানুষ কাফেরের মত জীবন যাপন করে। তোমরা নিজেদের জীবনে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্

(সা.)-এর উত্তম আদর্শ লালনের চেষ্টা কর এবং সেই অবস্থা সৃষ্টি কর। (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

একবার কতিপয় ব্যক্তি তাঁর (আ.) সমীপে উপস্থিত হয় এবং বয়আতও করে। বয়আতের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদেরকে কিছু নসীহত করেন। তিনি বলেন, "বয়আত করেই কারো এটি মনে করা উচিত নয় যে, এটি সত্য জামা'ত আর এতটুকু মানলেই সে কল্যাণমণ্ডিত হবে।" তিনি বলেন, "পুণ্যবান ও মুত্তাকী হও .... এ সময়গুলো দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত কর।" এরপর তিনি আরো নসীহত করেন এবং বলেন, "কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের সাথে আমলে সালেহ বা সৎকর্মের কথাও বলেছেন। আমলে সালেহ্ এমন কর্মকে বলা হয়, যাতে বিন্দু পরিমাণও ত্রুটি থাকে না। স্মরণ রেখো! মানুষের কর্মের পেছনে সর্বদা চোর লেগে থাকে। সেটি কী? সেটি হল, রিয়াকারী বা লোকদেখানো কর্ম করা (অর্থাৎ, লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করা), উজুব বা আত্মশ্লাঘা (অর্থাৎ, নিজের কাজে নিজেই আনন্দিত হওয়া" যে, আমি অনেক পুণ্যের কাজ করে ফেলেছি)। আর নানান ধরণের মন্দকর্ম ও পাপ, যা তার দ্বারা সাধিত হয়, সেগুলোর মাধ্যমে আমল নষ্ট হয়ে যায়। আমলে সালেহ্ হল এমন পুণ্যকর্ম, যাতে অত্যাচার, আত্মশ্লাঘা, লোক দেখানো কর্ম, অহংকার এবং মানুষের অধিকার হরণের চিন্তাও থাকে না।" তিনি বলেন, "আমলে সালেহ্র কারণে মানুষ যেভাবে পরকালে রক্ষা পায়, সেভাবে ইহজগতেও রক্ষা পায়। পুরো ঘরে যদি আমলে সালেহ্ বা সৎকর্মশীল একজন মানুষও থাকে, তাহলে পুরো ঘরই রক্ষা পায়। নিশ্চিত জেনো! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মাঝে আমলে সালেহ না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল মান্য করা কোন কাজে আসবে না। একজন চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলে এর অর্থ, তাতে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা যেন সংগ্রহ করে সেবন করা হয়। সে যদি এসব ঔষধ সেবন না করে আর ব্যবস্থাপত্র নিয়ে সযত্নে রেখে দেয়, তাহলে তার কী লাভ হবে!" তিনি বলেন, "এখনই তোমরা তওবা করেছ। তাই ভবিষ্যতে খোদা তা'লা এটি দেখতে চান যে, এই তওবার মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে কতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছ। এটি সেই যুগ, যখন খোদা তা'লা তাকওয়ার মাধ্যমে পার্থক্য নিরুপণ করতে চান। এমন অনেক মানুষই আছে, যারা খোদা তা'লার প্রতি অভিযোগ করে আর নিজেদের নফস বা অবাধ্য-প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি দেয় না। মানুষের অভ্যন্তরীণ-অমানিশাই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে, অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লা তো খুবই দয়ালু ও কৃপালু।" মানুষ যদি কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয়,তবে তা তার নিজের কারণেই হয়ে থাকে। কেননা, সে তার নিজের উপরই অত্যাচার করে। আল্লাহ্ তা'লা কারো প্রতি অন্যায় করেন না, তিনি তো খুবই দয়ালু ও কৃপালু। তিনি বলেন, "অনেক মানুষ এমনও আছে, যারা নিজেদের পাপ সম্পর্কে অবহিত থাকে। কিন্তু অনেকে এমনও আছে, যারা তাদের পাপ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না। তারা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা সবসময়ের জন্য ইস্তেগফারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।" অতএব, অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত আর বিশেষ করে এই দিনগুলোতে, যখন আপনারা দোয়ায় রত থাকবেন। জলসার পরিবেশই হল, দোয়ার পরিবেশ। কাজেই, দরূদ পড়ার পাশাপাশি অনেক বেশি ইস্তেগফারও করুন। তিনি বলেন, "প্রকাশ্য হোক বা গুপ্ত, কেউ জানুক বা না জানুক, হাত, পা, জিহ্বা, নাক এবং চোখের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল প্রকার পাপ থেকে মানুষ যেন ইস্তেগফার করতে থাকে। আজকাল আদম (আ.)-এর দোয়া অনেক বেশি পাঠ করা উচিত। "রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরীন" (সূরা আল্-আ'রাফ: ২৪) অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভূ-প্রতিপালক! আমরা আমাদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। হুযূর (আ.) বলেন, "এ দোয়াটি প্রথমেই গৃহীত হয়েছে (যখন থেকে আল্লাহ্ তা'লা এ দোয়াটি শিখিয়েছেন, তখনই এটি গৃহীত হয়ে গেছে।) উদাসীনতার মাঝে জীবনযাপন করো না।" কবুল করার জন্যই দোয়াটি শিখানো হয়েছে। কাজেই, সচেতনতার সাথে এ দোয়াটি করা উচিত।

হুযূর (আ.) বলেন, "উদাসীনতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করো না। যে ব্যক্তি উদাসীনতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করে না, সে কখনোই অসহনীয় কোন বিপদের সম্মুখীন হতে পারে না।" যদি উদাসীনতার মাঝে জীবন না কাটে, তবে কোন বিপদে পড়বে না। ইশারা-ইঙ্গিত না দিয়ে কোন বিপদ আসে না। হুযূর (আ.) বলেন, "যেভাবে আমার প্রতি এ দোয়া ইলহাম হয়েছে যে, "রাব্বি কুল্লু শাইয়্যিন খাদিমুকা রাব্বি ফাহফাযনি ওয়ানসুরনি ওয়ারহামনি" (অর্থাৎ, হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! প্রতিটি জিনিসই তোমার সেবক। অতএব, হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর) এ দোয়াটি অনেক বেশি পড়া উচিত। (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৪-২৭৬, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)

একবার এক বৈঠকে হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব (রা.) নিবেদন করেন, হুযূর! পারস্পরিক ঐক্য ও একতা সম্পর্কেও কিছু বলুন। এ কথা শুনে হুযূর (আ.) উপদেশ দেন, যার কিয়দাংশ এখন আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। হুযূর (আ.) বলেন, "আমি শুধু দুটি বিষয় নিয়েই এসেছি। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ বা একত্ববাদ অবলম্বন কর এবং দ্বিতীয়তঃ পরস্পর ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন কর। সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন কর, যা অন্যদের জন্য নিদর্শন-মূলক হয়। আর এই নিদর্শন-মূলক বৈশিষ্ট্যই সাহাবীদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল। "কুনতুম আ'দাআন ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম" (সূরা আলে ইমরান : ১০৪) অর্থাৎ, স্মরণ রেখো! পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া একটি নিদর্শন। স্মরণ রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা যদি তার ভাই-এর জন্য পছন্দ না করে, সে আমার জামা'তভূক্ত নয়।" তিনি আরো বলেন, "স্মরণ রেখো! বিদ্বেষ দূরীভূত হওয়া

মাহ্‌দীর সত্যতার লক্ষণ, সেই লক্ষণ কি পূর্ণ হবে না?" মাহ্‌দীর আগমনে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হবে। তাই তিনি বলেছেন, সেই লক্ষণ কি পূর্ণ হবে না? অবশ্যই এটি পূর্ণতা লাভ করবে। তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর না কেন? চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি নীতি হল, কিছু রোগে সার্জারী না করা পর্যন্ত রোগ দূর হয় না। আমার মাধ্যমে এক পুণ্যবান জামা'তের জন্ম হবে, ইনশাআল্লাহ্‌। পারস্পরিক শত্রুতার কারণ কী? কারণ হল– কার্পণ্য, আত্মশ্লাঘা এবং অহমিকা।" পূণ্যবানদের এই জামা'ত তো অবশ্যই বিজয়ী হবে, ইনশাআল্লাহ্‌। আর বিশ্বের বুকে আজ অনেক নিষ্ঠাবান আহমদীর জন্ম হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, "যারা নিজেদের আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রন করতে পারে না, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে জীবনযাপন করতে পারে না, এমন মানুষের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা স্বল্পদিনের মেহমান। উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন না করা পর্যন্ত আমি কারো জন্য বদনামী আখ্যায়িত হতে চাই না। এমন ব্যক্তি, যে আমার জামা'তভূক্ত হয়ে আমার ইচ্ছার অধীনে চলবে না, সে শুষ্ক শাখার ন্যায়। মালী সেটিকে না কেঁটে আর কী-বা করবে? শুষ্ক শাখা সতেজ শাখার সাথে যুক্ত থেকে পানি তো ঠিকই শুষে নেয়, কিন্তু সেই পানি তাকে সতেজ করতে পারে না। বরং সেই শাখা সতেজ শাখার জন্যেও ক্ষতির কারণ হয়। অতএব, ভয় কর! যে ব্যক্তি তার চিকিৎসা করবে না, সে আমার সাথে থাকতে পারবে না।" (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮-৪৯, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অতএব, যারা পারস্পরিক মনোমালিন্য বৃদ্ধি করে, তাদের জন্য এটি সত্যিই ভয়ের কারণ। বর্তমান যুগে যেহেতু আমরা সেই ব্যক্তিকে মেনেছি, যিনি আমাদের সংশোধনের জন্য এসেছেন, তাই এ উদ্দেশ্যে আমাদের চেষ্টাও করা উচিত আর তাঁর কথা মানা এবং সে অনুযায়ী কর্ম করাও আবশ্যক।

মানবতা কী আর মানবতার মানদন্ডই বা কী? একজন মুমিনের কেমন হওয়া উচিত? এ বিষয়গুলো উল্লেখ পূর্বক মানবতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "ইনসান শব্দটি আসলে উনসান শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে, অর্থাৎ- যার মাঝে দুটি সত্যিকার উনস থাকে" (বা ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে)। "একটি আল্লাহ্‌ তা'লার সাথে সম্পর্কযুক্ত আর অন্যটি সম্পর্ক রাখে মানবতার প্রতি সহানুভূতির সাথে। তার মাঝে যদি এ দুটি বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয়, তবেই সে মানুষ আখ্যায়িত হয়। আর ইনসান শব্দের এটিই নির্যাস।" এটিই মানবতার সারকথা, অর্থাৎ- দুটি সম্পর্ক স্থাপন কর। একটি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ে তোল এবং অপরটি পারস্পরিক প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর। তিনি (আ.) বলেন, "আর এ পর্যায়েই মানুষকে 'উলুল আলবাব' বা বুদ্ধিমান বলা হয়। এটি না হলে সবই অর্থহীন। সহস্র দাবি করতে পার কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'লা এবং তাঁর নবী ও ফিরিশতাদের দৃষ্টিতে (সব কিছুই) তুচ্ছ। (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

এরপর এ বিষয়টিকে পরিষ্কার করতে গিয়ে বলেছেন যে, জাগতিক কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আল্লাহ্‌ তা'লা বারণ করেন নি, বরং নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমরা অলস বসে না থেকে কর্ম কর। কিন্তু উদ্দেশ্য যেন বস্তু-জগৎ না হয়, বরং খোদার সন্তুষ্টিই যেন উদ্দেশ্য হয়। এ বিষয়টিকে সব সময় সামনে রাখা উচিত। জাগতিক নেয়ামতরাজি অর্জনের চেষ্টা করার পাশাপাশি পারলৌকিক কল্যাণরাজি অর্জনের জন্যেও পুরোদমে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্‌ তা'লা যে রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌ দুনিয়া হাসানাতাওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওয়া ক্বিনা আযাবান নার (সূরা আল বাকারা : ২০২) দোয়া শিখিয়েছেন। এতেও দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন্‌ দুনিয়াকে? তা হল, এমন 'হাসানাতুদ্‌ দুনিয়া' বা জাগতিক-কল্যাণ, যা পরকালের কল্যাণে পরিণত হবে। দোয়ার এই শিক্ষা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, জাগতিক কল্যাণ অর্জনের ক্ষেত্রে মু'মিনকে পারলৌকিক কল্যাণের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। আর এরই সাথে 'হাসানাতুদ্‌ দুনিয়া' শব্দের মাঝে জাগতিক-কল্যাণ আহরণের সেই সব উত্তম-মাধ্যমের কথাও বর্ণিত হয়েছে, যা একজন মুমিন-মুসলমানকে জাগতিক আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা উচিত। অতএব, এমন সব মাধ্যম অবলম্বন করে জাগতিক বিষয়াদি অর্জন কর, যা অবলম্বনের ফলে কেবল মঙ্গলও কল্যাণই লাভ হবে।" তাই জাগতিক আয়-উপার্জন করতে কোন নিষেধ নেই, তবে উপার্জন এজন্য কর এবং এমনভাবে কর, যেভাবে করলে তাতে শুধু কল্যাণ ও মঙ্গলই নিহিত থাকে। অন্যের অধিকার খর্ব করে নয় বা অন্যের ক্ষতি সাধান করে নয় অথবা অন্যের সম্পত্তি কুক্ষিগত করেও নয়। তিনি বলেন, "সেই পন্থা নয়, যা মানব জাতির জন্য কষ্টের কারণ হয় আর স্বজাতির মাঝেও কোন লজ্জার কারণ হয়। এমন জগৎ নিঃসন্দেহে 'হাসানাতুল আখেরাত' বা পারলৌকিক কল্যাণের কারণ হবে। (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১-৯২, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)। তোমাদের আয়-উপার্জন যদি এমন হয়, তবে এই আয়-উপার্জনও আখেরাতের জন্য কল্যাণের কারণ হবে। কেননা, যারা এভাবে আয়-উপার্জন করে, তারা পরে আল্লাহ্‌ তা'লা এবং তাঁর সৃষ্টি ও ধর্মের জন্যেও ব্যয় করে।

তিনি আরো বলেন, "সেই ব্যক্তিই আমাদের জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হয়, যে আমাদের শিক্ষাকে নিজ জীবনের কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করে এবং নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে এর উপর আমল করে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু নাম লিখিয়ে নেয় আর (আমাদের) শিক্ষা অনুসারে কাজ করে না, তার স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌ তা'লা এ জামা'তকে একটি বিশেষ জামা'তে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কাজেই, কোন ব্যক্তি যদি সত্যিকার অর্থে জামা'তভূক্ত না হয়, তবে শুধু নাম লিখেয়েই সে জামা'তভূক্ত হতে পারবে না।" এ কথার অর্থ হল, জামা'তী শিক্ষার উপর যদি সঠিকভাবে আমল না করে এবং সেই সব কথা যদি মেনে না চলে, তবে তিনি বলছেন, "শুধু

আমাদের বয়আত গ্রহনের পর তিনি (আ.) আমাদের মাঝে এক উন্নতমান দেখতে চেয়েছেন। জলসার উদ্দেশ্য হল, সেই মান অর্জনের চেষ্টা করা। অত-এব, প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা এ কথাটি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

নাম লিখিয়েই জামা'তভূক্ত হতে পারবে না। কেননা, তার জীবনে কখনো এমন সময় আসবে, যখন সে আলাদা হয়ে যাবে। তাই, যে শিক্ষা দেয়া হয়, সেই শিক্ষার উপর যথাসাধ্য আমল কর।আমল বা সৎকর্ম হল, ডানাস্বরূপ। আমল ছাড়া মানুষ আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা লাভের জন্য উড়তে পারে না।" পাখি যেভাবে ডানার উপর ভর করে ওড়ে, একইভাবে মানুষের সৎকর্মও তাকে আধ্যাত্মিক ভাবে উড্ডীন করে। "আর সেই সব মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সে অর্জন করতে পারে না, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা এর ফলে দান করেন। পাখিদের বোধ-বুদ্ধি রয়েছে, এরা যদি এই বোধশক্তিকে কাজে না লাগাত, তবে সে কাজ করা সম্ভব হতো না, যা তারা করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মৌমাছির যদি বুদ্ধি না থাকত, তাহলে সে মধু উৎপাদন করতে পারত না। অনুরূপভাবে, যে সমস্ত পোষা কবুতর রয়েছে, (কবুতরকে মানুষ প্রশিক্ষণ দেয়, যা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চিঠি নিয়ে যায়।) তাদের কতটা বুদ্ধি খাটাতে হয় এবং কত সুদূর পথ তাদের পাড়ি দিতে হয়! (অতীতকালে এ রীতিই অবলম্বন করা হতো) "আর চিঠি-পত্র পৌঁছে দেয়। অনুরূপভাবে, পাখিদের দ্বারা বিস্ময়কর সব কাজ করানো হয়। কাজেই, মানুষকে প্রথমে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে ভেবে দেখা উচিত, যে কাজটি আমি করার জন্য উদ্যত হয়েছি, তা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ সম্মত কি-না এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করছি কি-না?" অতএব, প্রতিটি কাজ করার পূর্বে ভেবে দেখা উচিত, আমি যে কাজটি করতে যাচ্ছি, তা ধর্মানুমোদিত কি-না? আল্লাহ্ তা'লা কি এটি করার অনুমতি দেন? এটি বৈধ কি-না? এমন নয় যে, জাগতিক আয়-উপার্জনের জন্য মানুষ সকল প্রকার অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা আরম্ভ করবে। তিনি বলেন, "সে যখন দেখে-শুনে এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবে, তখন স্বহস্তে কাজ করা আবশ্যক হয়ে যায়। আলস্য এবং ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা উচিত নয়। তবে শিক্ষা সঠিক কি-না, তা দেখে নেয়া আবশ্যক। কোন কোন সময় শিক্ষা সঠিকই থাকে কিন্তু মানুষ নিজের অজ্ঞতা এবং নির্বুদ্ধিতার কারণে বা অন্য কারো দুষ্কৃতি ও ভুল কথায় প্রতারণার স্বীকার হয়। কাজেই, নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩৯-৪৪০, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

তাকওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, যে কাজের জন্য আমাদেরকে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে তা হল, তাকওয়ার ময়দান ফাঁকা পড়ে আছে। তাকওয়া বা খোদাভীতি থাকা উচিত। তরবারি হাতে নিবে না, এটি নিষিদ্ধ। তাকওয়া অবলম্বন করলে সমগ্র পৃথিবী তোমাদের সাথে থাকবে। তাই, তাকওয়া সৃষ্টি কর। যারা মদ পান করে বা যাদের ধর্মীয় চিহ্নাবলীর প্রধান চিহ্নই হল মদ, তাকওয়ার সাথে তাদের কোন সম্পর্কই হতে পারে না। নেকী বা পূণ্যের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে লিপ্ত। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদের এ জামা'তকে এতটা সৌভাগ্য ও সুযোগ দান করেন যে, তারা পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং খোদাভীতি ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে উন্নতি করবে, তবে এটিই হল বড় সফলতা, এর চেয়ে অধিক কার্যকরী কিছুই আর হতে পারে না। এখন সারা পৃথিবীর ধর্মগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখবে, সেগুলো হতে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'তাকওয়া' হারিয়ে গিয়েছে আর জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খোদা বানানো হয়েছে। প্রকৃত খোদা আত্মগোপন করেছেন আর সত্যিকার খোদার অসম্মান করা হচ্ছে। কিন্তু খোদা এখন চান, তাঁকে যেন মানা হয় এবং জগদ্বাসী যেন তাঁকে চেনে। এই বস্তু-জগৎকেই যারা খোদা মনে করে, তারা খোদার উপর পূর্ণরূপে ভরসা করতে পারে না। (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

তিনি বলেন, "আল্লাহ্‌র ভয়াবহ আযাব নাযিল হতে যাচ্ছে। (তিনি অনেক কঠিন একটি সতর্কবাণী শুনিয়েছেন।) তিনি পবিত্র এবং নোংড়ার মাঝে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করতে চান। তিনি তোমাদেরকে ফুরকান বা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী দান করবেন, যখন তিনি দেখবেন যে, তোমাদের হৃদয়ে কোন ধরণের পার্থক্যই আর অবশিষ্ট নেই। কেউ যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গিকার করে বয়আত করে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এটিকে সে সত্য প্রমাণ না করে এবং অঙ্গীকারের বিশ্বস্ততা প্রকাশ না করে, তাহলে আল্লাহ্ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেন না। এভাবে যদি একজন নয়, বরং শতজনও যদি মারা যায়, তবে আমরা এটিই বলব যে, সে নিজের মাঝে পরিবর্তন সাধন করে নি। আর সেই সত্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি, যা অন্ধকার দূর করে আর হৃদয়কে দৃঢ় বিশ্বাস ও তৃপ্তি প্রদান করে, তা থেকে সে দূরে পড়ে আছে আর এ জন্যই সে ধ্বংস হয়েছে। (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠার টীকা, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অতএব, পৃথিবীতে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে, তা এ কথা চিন্তা করতে বাধ্য করে যে, পৃথিবীর পরিণাম কী হতে যাচ্ছে? সম্প্রতি এক ব্যক্তি বলেন, পৃথিবী খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এখন আমাদের কী হবে? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তো তাঁর একটি পঙক্তির মধ্যেও এর উত্তর দিয়েছেন। এখানেও এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যে, "সর্বত্র আগুন বিরাজ করছে, কিন্তু এমন

সবাইকে রক্ষা করা হবে, যারা মহাবিশ্বের অধিপতি খোদাকে ভালোবাসে।" (দুররে সামীন উর্দূ, পৃ. ১৫৪)

অতএব, এটিই হল মূল কথা। খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। আর খোদার প্রাপ্য প্রদানের পাশাপাশি তাঁর বান্দাদের অধিকারও আমাদের প্রদান করতে হবে। সেই সকল পূণ্য লাভের চেষ্টা করতে হবে, যা খোদার নির্ধারিত নীতি অনুসারে পূণ্য বলে গণ্য হয় এবং পাপ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সেই সকল পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে, যা খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে পাপ আর যেগুলোর কথা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্তায় ঈমান আনার পর বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়তর হওয়ার চেষ্ট করতে হবে। এসব বিষয়ই আমাদের মুক্তির কারণ হবে।

আর এসব বিষয়ই খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়, অন্যথায় এই পঞ্চাশ, পচাত্তর বা শত বছরের যেটিই বিভিন্ন জামা'তের জীবনে আসুক না কেন, এই বিপ্লব ছাড়া এগুলোর কোনই মূল্য নেই। এগুলো উদ্‌যাপন করে বস্তুজগতের মানুষ আনন্দিত হয়, কিন্তু ধর্মীয় জামা'ত নয়। আনন্দের বহিঃপ্রকাশ যদি এ উদ্দেশ্যে হয় যে, খোদার নির্দেশে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি করেছি এবং ভাবিষ্যতে আরো বেশি চেষ্টা করব, তাহলে এমন বহিঃপ্রকাশও আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মত এবং বৈধ বিষয়। সকল প্রকার পূণ্যের ক্ষেত্রে আমাদের পদক্ষেপ যদি সম্মুখপানে অগ্রসরের পরিবর্তে থেমে যায় বা পশ্চাৎপদ হতে শুরু করে, তাহলে সত্যিই এটি খুব চিন্তার বিষয়। তাই, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপদেশাবলী সামনে রেখে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী মেনে চলার ক্ষেত্রে আমাদের কর্মের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আর সর্বদাই এমন বিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত। ইনশাআল্লাহ্, এখানে যখন জামা'ত প্রতিষ্ঠার পচাত্তর বছর পূর্ণ হবে, তখন যেন আমরা বলতে পারি, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গিকার আমরা করেছিলাম, তার ওপর আমরা শুধু প্রতিষ্ঠিতই নই, বরং এ ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি করেছি। আল্লাহ্ তা'লা এর সবাইকে তৌফিক দান করুন।

ইতিপূর্বেও আমি বলে এসেছি যে, জলসার সময় বিশেষ করে এই তিনটি দিন দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করুন। আর জলসার উদ্দেশ্য হল এর অনুষ্ঠানগুলো শুনা। তাই সবাই উপস্থিত থেকে জলসার কার্যক্রম শুনুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর, ২০১৬)
কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

হজ্জ ও জলসার পৃথক তাৎপর্য

'লেকা মা'আল আরব'– অনুষ্ঠানের একটি পর্বে "আহমদীরা জলসাকে হজ্জের তুল্য বলে মনে করে"– এ অভিযোগের উত্তরে হুযূর (আই.) বলেন, হজ্জ স্থায়ীভাবে মক্কা ও তদ্‌সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত বিশেষ ইবাদত। এটি অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে পারে না। তবে ইসলামের কার্যকর-কেন্দ্র নবী বা তাঁর প্রতিনিধির সাথে সাথে চলতে থাকে। যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনাতে ছিলেন, তখন হজ্জের কেন্দ্র মক্কা হলেও ইসলামের কার্যকর-কেন্দ্র নবী বা তাঁর প্রতিনিধির সাথে সাথে চলতে থাকে। যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনাতে ছিলেন, তখন হজ্জের কেন্দ্র মক্কা হলেও ইসলামের কার্যকর-কেন্দ্র ছিল মদীনা। আর দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ইসলামের শিক্ষা ও চর্চার জন্য মদীনাতে সমবেত হতেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ লোকে দুনিয়াবী কারণে পাশ্চাত্য সফরে গেলে, এমনকি হজ্জ না করে সেখানে গেলেও, কোন আপত্তি করে না। অথচ ধর্মের জন্য যুগ-ইমামের সাথে মিলিত হতে গেলে আপত্তি ওঠে। তবে সেই সাথে মনে রাখা দরকার, আহমদীরা অবশ্যই এ বিশ্বাস রাখে যে, যদি কেউ ৫০ বারও জলসায় যোগদান করেন, তথাপি হজ্জের দায়িত্ব তার মাথার ওপর ঝুলে থাকে। আর শর্তাবলী পূর্ণ হলে এ ফরয তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে।

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৬৬)

পাপ থেকে মুক্তি লাভের প্রকৃত উপায় কি?

পাপীদের অপরাধের জন্য যীশুর অভিশপ্ত হওয়া অযৌক্তিক–এই বিষয়ে

খৃষ্টান সিরাজউদ্দিন নামক এক খৃষ্টধর্ম-অবলম্বনকারীর প্রশ্নের উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-বলেনঃ

"খৃষ্টানদের মতে, যীশুখৃষ্ট পৃথিবীতে এই জন্য আগমন করিয়াছিলেন যেন তিনি পাপীদের সহিত প্রেম করিয়া তাহাদের পাপসমূহের অভিশাপ স্বীয় মস্তকে বহন করেন এবং ঐ সকল পাপীকে পাপ–মুক্ত করার উদ্দেশ্যে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন। পাপীদের উদ্ধারের জন্য কি এইরূপ অভিশপ্ত-কোরবানীর নমূনা কোরআন পেশ করিয়াছে? যদি ইহা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে কোরআন মানবের মুক্তির জন্য কি ইহা অপেক্ষা কোন উত্তম পথ প্রদর্শন করিয়াছে? ইহার উত্তরে প্রশ্নকারী খৃষ্টধর্মের অনুসারী মিয়াঁ সিরাজউদ্দীন সাহেব মনে রাখিবেন যে, কোরআন পাপীদের মুক্তির জন্য এই ধরণের অভিশপ্ত কোরবানী পেশ করে না। বরং কোটি কোটি মানুষের পাপের অভিশাপ একত্র করিয়া এক জনের ঘাড়ে চাপান দূরে থাকুক, এমনকি মাত্র এক ব্যক্তির পাপ বা অভিশাপ অপর এক ব্যক্তি ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া কোরআন আদৌ ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ মনে করে না। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলোঃ 'একের পাপ অপরে বহন করিবে না।' (সূরা আনআমঃ ১৬৫ আয়াত)।

মুক্তির সমস্যা সম্বন্ধে কোরআনের শিক্ষা বর্ণনার পূর্বে খৃষ্টানদের নীতি বা মতবাদের ভ্রান্তি জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করি, যাহাতে এই সমস্যা সম্পর্কে যাঁহারা কোরআন ও ইঞ্জিলের মধ্যে তুলনা করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন সহজে তাহা করিতে পারেন। অতএব, স্বরণ রাখিবেন যে, খৃষ্টানদের মতে খোদা তা'লা পৃথিবীকে ভালবাসিয়া উহার মুক্তির জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, খোদাদ্রোহী, কাফের এবং পাপীদের পাপ স্বীয় প্রিয়-পুত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন এবং পৃথিবীকে পাপ হইতে মুক্তি দিবার জন্য তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং অভিশপ্ত কাষ্ঠে লটকাইয়াছেন। এই মূল নীতি সকল দিক দিয়াই অলীক এবং লজ্জাকর। যদি ন্যায়-নীতির তুলাদন্ডে ওজন করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইহা 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানোর মত গুরুতর অন্যায়। মানবের বিবেক ইহা কখনও পছন্দ করিবে না যে, একজন অপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার অপরাধের শাস্তি অন্য এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে দেওয়া হউক। যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি–ভঙ্গিতে পাপ–তত্ত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলেও ইহা অলীক সাব্যস্ত হইবে। কেননা প্রকৃত পক্ষে পাপ এমন এক বিষ, যাহা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন মানুষ খোদা তা'লার প্রতি আনুগত্য, তাঁহার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রেম এবং তাঁহার প্রেমপূর্ণ স্মরণ হইতে স্খলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়। কোন উৎপাটিত বৃক্ষ যেমন মাটি হইতে রস শোষণ করিবার ক্ষমতা হারাইয়া দিন দিন শুকাইতে থাকে এবং অবশেষে উহার সরসতা ও সজীবতা বিনাশ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ, যাহার মন খোদা তা'লার প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহারও অবস্থা অনুরূপ হয়। শুষ্কতার ন্যায় পাপ তাহার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে। এই পাপরূপী শুষ্কতার প্রতিকারের জন্য খোদা তা'লার বিধানে তিনটি পদ্ধতি বর্ণিত আছেঃ (১) প্রেম ও ভালবাসা এবং (২) 'এস্তেগফার', যাহার অর্থ চাপিয়া এবং ঢাকিয়া দেওয়ার ইচ্ছা–কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত বৃক্ষের শিকড় মাটিতে প্রোথিত ও আবৃত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা সজীবতার আশা রাখে এবং (৩) তৃতীয় বিধান হইল তওবা বা অনুশোচনা-জীবনবারি আকর্ষণ করার জন্য খোদা তা'লার দিকে বিনম্রভাবে প্রত্যাবর্তন করা এবং নিজ সত্তাকে তাঁহার নিকটবর্তী করা এবং সময়োপযোগী সৎকর্ম দ্বারা পাপের আবেষ্টন হইতে নিজেকে বাহির করা। তওবা শুধু মৌখিক নহে, বরং তওবার পূর্ণতা সৎকর্মের সহিত সংযুক্ত। যাবতীয় সৎকর্মই তওবার পূর্ণতার জন্য। সকল সৎকর্মের উদ্দেশ্যই খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করা। দোয়াও এক প্রকার তওবা। উহার দ্বারা আমরা খোদা তা'লার নৈকট্য অন্বেষণ করি। এই জন্য খোদা তা'লা প্রাণ সৃষ্টি করিয়া উহার নাম রূহ রাখিয়াছেন, যেহেতু উহার প্রকৃত আনন্দ ও আরাম খোদা তা'লার স্বীকৃতিতে এবং তাঁহার প্রেম ও তাঁহার আদেশ পালনে নিহিত। আবার তিনি উহার নাম 'নফস' (অভিধানে 'নফস' বস্তুর সত্তাকে বুঝায়) রাখিয়াছেন, যেহেতু উহা খোদা তা'লার সহিত ঐক্য সৃষ্টি করে। খোদা তা'লার

সাথে প্রেমে মগ্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত বাগানের সেই বৃক্ষের ন্যায়, যাহার শিকড় মৃত্তিকার মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হইয়াছে। ইহাই মানুষের বেহেশ্‌ত। বৃক্ষ যেভাবে মাটির রস গ্রহণ করে এবং নিজের মধ্যে টানিয়া লয় এবং উহার সাহায্যে আপন বিষাক্ত বায়ু বাহির করিয়া ফেলে, মানব মনের অবস্থাও তদ্রুপ। সে খোদা তা'লার প্রেমের পানি গ্রহণ করিয়া তাহার অন্তর হইতে বিষাক্ত পদার্থ বাহির করিয়া ফেলিতে সক্ষম হয় এবং অতি সহজে সেইসব বিষাক্ত বস্তু দূর করিয়া দিয়া খোদা তা'লার মধ্যে বিলীন হইয়া সে পবিত্র পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে। ফলে, তাহার আত্মা অত্যন্ত প্রশস্ত, সজীব ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়। কিন্তু খোদা হইতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সেই পুষ্টিসাধনকারী পানি গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া সে প্রতি মুহূর্তে শুস্ক হইতে থাকে। অবশেষে, পাতা ঝরিয়া শুস্ক ও সৌন্দর্যবিহীন শাখার সমষ্টি মাত্র থাকিয়া যায়। সুতরাং যেহেতু পাপের শুস্কতা সম্পর্কহীনতা হইতে উদ্ভূত হয়, এইজন্য এই শুস্কতার একমাত্র চিকিৎসা হইল খোদা তা'লার সহিত দৃঢ়-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা। প্রাকৃতিক বিধান ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই দিকে ইশারা করিয়া আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, 'হে খোদা তা'লা হইতে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তোমার প্রতিপালকের দিকে এমতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন কর যে, তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব, তুমি আমার ভক্তগণের অন্তর্গত হও এবং আমার বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর।' (সূরা ফজর ঃ ২৮–৩১ আয়াত)

প্রথম পদ্ধতি, অর্থ্যাৎ- পাপ বিদূরিত করিবার একমাত্র উপায় খোদা তা'লার সহিত প্রেম ও ভালবাসা। অতএব, যেসকল সৎকর্ম প্রেম ও ভালবাসা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সকল সৎকর্ম পাপের আগুনে পানি নিক্ষেপ করে। কেননা, মানুষ খোদা তা'লার জন্য সৎকর্ম করিয়া তাহার প্রেমের প্রমাণ দেয়। খোদা তা'লাকে এরূপভাবে মান্য কর, যেন তাঁহাকে প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়; এমন কি, স্বীয় প্রাণের উপরেও প্রাধান্য দেওয়া হয়– ইহাই প্রেমের প্রথম-সোপান। ইহার দৃষ্টান্ত সেই বৃক্ষের, যাহা মাটিতে রোপণ করা হয়। ইহার পর দ্বিতীয় সোপান 'এস্তেগফার', যাহার উদ্দেশ্য হইল খোদা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন মানবসুলভ দুর্বলতা প্রকাশ না পায়। এই স্তর বৃক্ষের সেই অবস্থার অনুরূপ, যখন উহা সুদৃঢ়ভাবে স্বীয় কাণ্ড মাটিতে প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। ইহার পর তৃতীয় সোপান হইল তওবা, যাহার তুলনা বৃক্ষের সেই অবস্থার সহিত, যখন উহা স্বীয় কাণ্ড পানির নিকটবর্তী করিয়া শিশুর ন্যায় উহা চোষন করিতে থাকে। বস্তুতঃ পাপের দার্শনিক তত্ত্ব ইহাই যে, খোদা তা'লার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে উহার উৎপত্তি। অতএব, ইহা বিদূরিত করার উপায় খোদা তা'লার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের সহিত বিজড়িত। কত নির্বোধ তাহারা, যাহারা কোন ব্যক্তির আত্মহত্যাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত মনে করে!

ইহা বড় হাস্যকর কথা যে, কোন ব্যক্তি অপরের মাথা ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য স্বীয় মাথায় পাথর মারে বা অপরকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করে। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীতে এমন কোন বুদ্ধিমান নাই, যে এই জাতীয় আত্মহত্যাকে মাবনতার প্রতি সহানুভূতি বলিবে। মানবতার প্রতি সহানুভূতি অবশ্যই উত্তম গুণ এবং অপরের জন্য যাতনা সহ্য করা বড়ই বীরত্বের কাজ। কিন্তু সেই সকল যাতনার বোঝা বহন করার পন্থা কি ইহাই, যাহা যীশুর সম্পর্কে বলা হয়? হায়! যীশু যদি আত্মহত্যা হইতে বিরত থাকিতেন এবং অপরের শান্তির জন্য বুদ্ধিমানের ন্যায় কষ্ট ভোগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা অবশ্যই পৃথিবী উপকৃত হইত। যথা- কোন গৃহহীন দরিদ্র ব্যক্তি যদি ঘরের কাজে মিস্ত্রী লাগাইতে সক্ষম না হয় এবং এমতাবস্থায় যদি কোন মিস্ত্রি তাহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া কিছু দিন পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে তাহার ঘর তৈরী করিয়া দেয়, তাহা হইলে অবশ্য সেই মিস্ত্রি প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র। সে এক দরিদ্রের গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়া নিশ্চয় তাহার প্রতি দয়া দেখাইয়াছে। কিন্তু সে যদি ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া দেখাইয়া আপন মাথায় পাথর মারিত, তাহাতে সেই অসহায় ব্যক্তির কি লাভ হইত? পরিতাপ! পৃথিবীতে খুব অল্প লোকই আছে, যাহারা সৎকর্মের অনুশীলন ও দয়া প্রদর্শনে বুদ্ধিমানের পন্থা অবলম্বন করে। যীশু যদি সত্যই ইহা মনে করিয়া আত্মহত্যা করিয়া গিয়া থাকেন যে, তাহার সদৃশ-মরণে মানব জাতি মুক্তি পাইবে, তাহা হইলে তিনি করুণা ও কৃপার পাত্র। তাঁহার এই ঘটনা জগতের সম্মুখে পেশ করার যোগ্য নহে; পরন্তু উহা গোপন করার যোগ্য।

যীশু সম্পর্কে আরোপিত খৃষ্টানদের এই নীতিকে যদি আমরা অভিশাপের অর্থে যাচাই করি, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইবে যে, তাহারা এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যীশুর প্রতি এরূপ বে–আদবী করিয়াছে, যাহা পৃথিবীর কোন জাতি তাহাদের নবী–রসূলের প্রতি করে নাই। কারণ তিন দিনের জন্য হইলেও যীশুর অভিশপ্ত হওয়া খৃষ্টানগণের ধর্ম–বিশ্বাসের অঙ্গ। যীশুকে অভিশপ্ত বলিয়া না মানিলে খৃষ্টিয় ধর্ম–বিশ্বাস অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তবাদ এবং কোরবানী ভিত্তিক ক্রুশবাদ বাতিল হইয়া যায়। অভিশাপই যেন এই সকল ধর্ম–বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ও কড়িকাঠ!

মানব জাতির প্রতি ভালবাসার জন্য পৃথিবীতে যীশুর প্রেরণ এবং মানব জাতির জন্যই তাঁহার প্রাণ দানের কথা খৃষ্টানদের ধারণা মতে তখনই ফলপ্রদ হয়, যখন বিশ্বাস রাখা যায় যে, যীশু পৃথিবীর আদি পাপের জন্য অভিশপ্ত হইয়াছেন এবং অভিশপ্ত কাষ্ঠে আনত হইয়াছেন। এইজন্য আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়া আসিয়াছি যে, যীশু-খৃষ্টের কোরবানী অভিশপ্ত-কোরবানী। পাপ হইতে অভিশাপ আসিয়াছে এবং অভিশাপ হইতে তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছেন। এখন বিচার্য বিষয় হইল, অভিশাপের ছাপ কি কোন সত্যবাদীর উপর আরোপ করা যাইতে পারে? সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, খৃষ্টানগণ যীশুর প্রতি অভিশাপ আরোপ করিয়া বড়ই ভুল করিয়াছে, যদিও উহা মাত্র তিনি দিনের জন্য, অথবা ইহা অপেক্ষা আরও অল্প সময়ের জন্যই হউক না কেন। কারণ, অভিশাপ এমন এক বিষয়, যাহা অভিশপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক রাখে এবং কোন ব্যক্তিকে তখনই অভিশপ্ত বলা যায়, যখন তাহার অন্তঃকরণ খোদা হইতে একেবারে বিমুখ হইয়া তাঁহার শত্রু হইয়া যায়। এই জন্যই শয়তানকে লায়ীন বা অভিশপ্ত বলা হয়। এই কথা কাহারও অজানা নাই যে, নৈকট্য হইতে

দূরে সরিয়া যাওয়াকে 'লানত' বলে। এই বাক্য সেই ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, যাহার অন্তঃকরণ খোদা তা'লার প্রেম এবং এতায়াত (আনুগত্য) হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে সে খোদা তা'লার শত্রু হইয়া গিয়াছে। 'লানত' শব্দের তাৎপর্য ইহাই। অভিধান প্রণেতাগণ সকলেই এই বিষয়ে একমত।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য, সত্যই যদি যীশুখৃষ্টের উপর অভিশাপ অবতীর্ণ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চতভাবে মানিতে হইবে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'লার অভিশাপের পাত্র হইয়াছিলেন। খোদা তা'লার মারেফত, এতায়াত এবং মুহব্বত তাঁহার অন্তর হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি খোদার শত্রু এবং খোদা তা'লাও তাঁহার শত্রু হইয়া গিয়াছিলেন। খোদা তা'লাও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তিনিও খোদা তা'লার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ লানতের তাৎপর্য ইহাই। এইরূপ হইলে ইহাই বুঝায় যে, অভিশপ্ত দিনগুলিতে তিনি প্রকৃতই কাফের, খোদা তা'লা হইতে বিমুখ এবং খোদা তা'লার শত্রু হইয়াছিলেন এবং শয়তানের স্বভাব ধারণ করিয়াছিলেন। যীশুর সম্বন্ধে এই জাতীয় বিশ্বাস পোষণ, আর নাউযুবিল্লাহ্ তাঁহাকে শয়তানের ভাই বলা সমান। আমার বিশ্বাস, কোন সত্যবাদী নবী সম্পর্কে এই জাতীয় ধৃষ্টতা কোন খোদাভীরু মানুষ পোষণ করিতে পারে না। একমাত্র দুষ্ট ও অপবিত্র লোকের দ্বারাই ইহা সম্ভব।

অতএব, যীশুখৃষ্টের আত্মা অভিশপ্ত হওয়া যখন মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে মানিয়া লইতে হইবে যে, এই জাতীয় অভিশপ্ত কোরবানীও মিথ্যা। ইহা ভ্রান্ত ও অজ্ঞ লোকদের দ্বারা রচিত। মুক্তি লাভের জন্য যদি প্রথমে খৃষ্টকে শয়তান, খোদার শত্রু ও খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট সাব্যস্ত করিতে হয়, তাহা হইলে এরূপ মুক্তির উপর অভিশাপ। ইহা অপেক্ষা দোযখ বরণ করিয়া লওয়া খৃষ্টানগণের জন্য উত্তম ছিল; কিন্তু তবুও আল্লাহর একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শয়তানের উপাধি দ্বারা কলুষিত করা উচিত হয় নাই। পরিতাপ! তাহারা কিরূপ অন্তঃসারশূন্য ও অপবিত্র কথার উপর ভরসা করিয়া রহিয়াছে। এক দিক দিয়া তাহারা তাঁহাকে খোদার পুত্র, খোদা হইতে উদ্ভূত এবং খোদা তা'লার সহিত একীভূত বলিয়া মনে করে, অপর দিকে তাহারা তাঁহাকে শয়তান উপাধি দেয়, 'অভিশপ্ত' বলে। লানত বা অভিশাপ শয়তানের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং লায়ীন, শয়তানের নাম। লানতী বা অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শয়তান হইতে উদ্ভূত, শয়তানের সহিত মিলিত এবং নিজে শয়তান। সুতরাং খৃষ্টানদের মতে যীশুর মধ্যে দুই প্রকারের ত্রিত্ববাদ পাওয়া যায়– রহমানী ও শয়তানী। নাউযুবিল্লাহ, যীশু শয়তানের অন্তর্গত হইয়া শয়তানের মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়াছিলেন এবং লানতের ফলে শয়তানী-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ খোদার অবাধ্য ও খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি খোদার শত্রু হইয়াছিলেন! খৃষ্টা-ধর্মের অনুসারী মিয়াঁ সিরাজউদ্দীন! বিচারের সহিত বলুন। এই মিশন, যাহা খৃষ্টের উপর আরোপ করা হয়, উহার মধ্যে কি কোন আধ্যাত্মিক বা যৌক্তিক পবিত্রতা আছে?

পৃথিবীতে কি ইহা অপেক্ষা জঘন্য আর কোন বিশ্বাস আছে, যাহাতে নিজের মুক্তির জন্য কোন খোদা–প্রেমিককে খোদার শত্রু এবং খোদা-দ্রোহী ও শয়তান সাব্যস্ত করা হয়? খোদা তা'লা, যিনি সর্বশক্তিমান, অনন্ত করুণাময় এবং দয়াময়, তাঁহার জন্য এই লানতী (অভিশপ্ত) কোরবানীর কি আবশ্যক ছিল?" [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ 'খৃষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তক]

[চলবে]

বিজ্ঞপ্তি

আপনারা অবগত আছেন যে, হুযূর (আই.) তাহরীকে জাদীদের ৮৩তম বৎসরের ঘোষণা করেছেন এবং সকল আহমদীকে তাহরীকে জাদীদের ওয়াদায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে হুযূর (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত পত্রে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও তাগিদ রয়েছে যাতে চাঁদার ওয়াদা পূর্বের চেয়ে বেশী করা হয় এবং প্রত্যেক জামাত এর অংশগ্রহণকারীর সদস্য সংখ্যা নওমোবাইন সহ ১০০% পূর্ণ হয়। সে দিকে সবার বিশেষ দৃষ্টি দানের জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি।

হুযূর (আই.) এর দপ্তর হতে প্রাপ্ত পত্রে আরও বলা হয়েছে যে, জামাতের সদস্যগণ যাতে প্রবল-আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে তাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খরচ হতে কিছু টাকা বাঁচিয়ে প্রতি মাসে তাহ্‌রীকই জাদীদের চাঁদা প্রদান করেন। অর্থাৎ- তাহ্‌রীকে জাদীদের চাঁদা প্রতি মাসে আদায় করার অভ্যাস করতে হবে।

আপনাদের নিকট বিনীত নিবেদন, আসন্ন রমযান মাসে তাহ্‌রীকে জাদীদের চাঁদা অগ্রীম আদায়ের মাধ্যমে তাহ্‌রীকে জাদীদ চাঁদা ১০০% আদায়ে সচেষ্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে এবং আদায়কৃত চাঁদার রিপোর্ট আগামী ২৫ রমযানের মধ্যে ন্যাশনাল আমীর এর দপ্তরে পাঠাতে হবে। কেননা, প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও তাহ্‌রীকে জাদীদের চাঁদা পরিশোধকারীগণের তালিকা (জামাত ওয়ারি সংখ্যা ও টাকার পরিমাণসহ) হুযূর আকদাস (আই.) এর দপ্তরে দোয়ার জন্য প্রেরণ করা হবে।

সুতরাং আমাদের সকলের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন আমরা আমাদের প্রাণ-প্রিয় হুযূরের দোয়ার বরকতের অংশীদার হতে পারি।

শহীদুল ইসলাম বাবুল
সেক্রেটারী তাহ্‌রীকে জাদীদ
মোবাইল: ০১৭১৪-০৮৫০৭০/০১৭৩০০২৮৫৭৬

ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত যুগ-খলীফার সফরে আশিসমন্ডিত হলো কানাডা

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

(শেষ কিস্তি)

১১ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণ-প্রিয় নেতা ও ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কানাডার আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'ক্যালগেরী শান্তি-সম্মেলন'-এ মূল-বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কানাডার সাবেক প্রধান মন্ত্রী সম্মানিত ষ্টিফেন হার্পার, ক্যালগেরীর মেয়র মিঃ নাহিদ নেন্‌শি এবং হিউম্যান সার্ভিসেস-এর প্রদেশিক মন্ত্রী মিঃ ইরফান সাবির সহ ৬৫০ জনেরও অধিক উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও দেশটির প্রথম সারির সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বেশ ক'জন উর্ধতন-প্রতিনিধি, উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানগণ এবং সংবাদ-মাধ্যমগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এ অনুষ্ঠাটির আগে হুযূর (আই.) সম্মানিত স্টীফেন হার্পার-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন এবং সে সময় শান্তি-বিস্তার ও মানব-হিতৈষী কর্মকান্ডে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চলমান প্রচেষ্টার জন্যে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মহোদয় হুযূর (আই.)কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি চলাকালে হুযূর (আই.) বিশ্বে ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং একটি তৃতীয়-বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকির বিষয়েও সাবধান করেন। তিনি (আই.) মুসলিম চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, তাদের কর্মকান্ডগুলো সম্পূর্ণরূপেই ইসলামী-শিক্ষার বিরোধী। এ পর্যায়ে হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের বেশ ক'টি আয়াত এবং নবী করীম (সা.) এর জীবনের বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ করেন, যেগুলো ইসলামের শান্তিপূর্ণ-শিক্ষার পরিচয় বহন করে। তিনি (আই.) কতিপয় অ-মুসলিম শিক্ষাবিদের লেখা থেকেও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে উদ্ধৃতি দান করেন। বিশ্বে শান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন: "প্রত্যেকেই এটা উপলব্ধি করেন যে, বর্তমানে বিশ্বে শান্তি ও ঐক্যের চরম অভাব বিদ্যমান। এ সত্যটি উপলব্ধি করা সত্বেও মনে হয়, শান্তি ও ঐক্য কিভাবে অর্জন করা যায়, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে মানুষ আদৌ আগ্রহী নয়। দুঃখের বিষয় যে, বিশ্বের অনেক অংশেই মানুষ পরস্পরের ওপর কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা-কল্পে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অধিকতর চাপ প্রয়োগ করছে এবং এভাবে অন্যদের ওপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রত আছে"। হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "মূলত: মুসলিম দেশগুলোকে অথবা তথা-কথিত 'ইসলামী-দল' গুলোকে ঘিরে বর্তমানে বিশ্বে যে অশান্তির আগুন জ্বলছে, সে প্রেক্ষিতে আপনাদের মধ্য থেকে কতক লোক এ প্রশ্নের-অবতারণা করতে পারেন যে, এমতাবস্থায় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন মুসলিম-নেতার বক্তব্য কী? যা হোক, এ বিষয়ে ধারণা দেবার আগে ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। কারো পক্ষেই এমন কোন ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, চরমপন্থী বা সন্ত্রাসীরা যা করছে, তা ইসলাম-সম্মত"।

এ পর্যায়ে হুযূর (আই.) বর্ণনা করেন যে, মানুষের অধিকারকে সমুন্নত করার ক্ষেত্রে সরকারগুলো কতোটা অকৃতকার্য হয়েছে, যার পরিণামে চরম-পন্থা ও সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে, আর অনেকগুলো মুসলিম দেশের পতন ঘটেছে। তিনি (আই.) বলেন যে, অশান্তির মূল-কারণই হচ্ছে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের অভাব। হুযূর (আই.) বলেন ঃ ইতোপূর্বে অনেক উন্নত দেশকেও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা হয়েছে এবং সেগুলোকে চরম দুর্দশাপূর্ণ গৃহযুদ্ধে বিজড়িত করা হয়েছে। এসব সংঘাত এবং সবগুলো যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হবার মূল-কারণই হচ্ছে সেসব দেশে বসবাসকারী অধিকাংশ মুসলমান

তাদের ধর্মের খাঁটি-শিক্ষা ভুলে গিয়েছিল এবং পরস্পরের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। ন্যায়বিচার এবং অখন্ডতা প্রদর্শনের স্থলে কেবলমাত্র লোভ ও ক্ষমতার আকাঙ্খা দ্বারা তারা অনুপ্রাণিত হয়। দুঃখজনকভাবেই এর ফল এটা দাঁড়ায় যে, শান্তি তিরোহিত হয় এবং একই সাথে জনগণ অস্থিরতার শিকারে পরিণত হয়"।

মুসলমানদের কাছে ইসলাম ন্যায়বিচারের যে মানদন্ড আশা করে, সে বিষয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে যে, সত্যকে সমর্থন করতে গিয়ে একজন মানুষের উচিত, প্রয়োজনে তার নিজের বিরুদ্ধে অথবা তার প্রিয়-পাত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানেও প্রস্তুত থাক। একথা বলাটা খুবই সহজ যে, 'আমি আমার বিরুদ্ধে কথা বলতে প্রস্তুত আছি। যাহোক, বাস্তবে এমন এক অবস্থা বজায় রাখা অবিশ্বাস্যভাবেই কষ্টকর। তথাপি, এটাই হচ্ছে সেই লক্ষ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান, যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মুসলমানদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন, যার মধ্যে তিনি বলেছেন যে, সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রকাশ হতে পারে না, যতক্ষণ না কোন মানুষ তার ব্যক্তিগত সুবিধাগুলোকে ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়েছে"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "যদি অনুশীলিত হয়, তবে শুধু মুসলিম দেশগুলোতেই নয়, বরং প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক শহরে, প্রত্যেক মহানগরে এবং বিশ্বের প্রত্যেক জাতিতেই অনুপম এ নীতিটিই হচ্ছে শান্তি স্থাপনের উপায়"।

প্রাথমিক-যুগের মুসলমানদেরকে যে কারণে আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধে নিয়োজিত হবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, সেটার ব্যাখ্যায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান বলেন যে, সেটা ছিল লাগাতার কয়েক বছর ধরে মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া। তিনি (আই.) বলেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এ-কারণেই এ অনুমতি দিয়েছিলেন, যাতে সব ধর্মের সকল মানুষই তাদের স্ব স্ব ধর্ম-বিশ্বাসকে রক্ষা করার স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "ইসলামের আলোকিত-শিক্ষগুলোর এক মহান প্রকাশ হচ্ছে এই যে, জিহাদ করার অনুমতি পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে কেবল এজন্যে দেয়নি যে, তারা শুধু ইসলামকেই রক্ষা করবে, অথবা একারণে দেয়নি যে, অন্যথায় সবগুলো মসজিদ ধ্বংস হয়ে যাবে, বরং এ অনুমতিটি দেয়া হয়েছিল সবগুলো ধর্মকেই রক্ষা করতে এবং সব ধর্মের ইবাদত-স্থানগুলোকে রক্ষা করতে, তা সেটা গীর্জা, দেবালয়, ইহুদীদের উপাসনালয়, মসজিদ, অথবা অন্য যে-কোন ধর্মের উপাসনালয়ই হোক"। এরপর হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "প্রথমিক যুগের মুসলমানরা তাদের নিজেদের জীবন রক্ষা করার জন্যে নয়, বরং সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষাকল্পে এবং বিবেক-বুদ্ধি ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার বৈশ্বিক-মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতেই সব ঝুঁকি নিয়েছিলেন। সেসব মুসলমান একারণে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, যাতে অত্যাচারের সেই হাত বিচূর্ণ হয়, যা বিশ্ব-শান্তিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল"।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন যে, বিশ্বের অশান্ত পরিস্থিতির দায় কেবলমাত্র মুসলমানদের ওপর চাপানো যায় না। কতিপয় অমুসলিম জাতিই অস্ত্র তৈরী করে সেগুলো মুসলমানদের কাছে বিক্রী করেছিলো, যা যুদ্ধের ইন্ধন যুগিয়েছে। তিনি (আই.) আরো বলেন ঃ "মুসলমান-বিশ্বের ক্ষতি সাধনকারী যুদ্ধকে শেষ করার পরিবর্তে বৃহৎ-শক্তিগুলো আসলে সেগুলোকে আরো প্রজ্জ্বলিত করছে। শান্তিকে অগ্রাধিকার দানের পরিবর্তে বৃহৎ-শক্তিগুলো লাগাতার ভাবে নিজদের প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে এবং এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে তারা লাভবান হতে চেয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, আজ যে যুদ্ধ চলমান আছে, সেটা ধর্মীয় কোন কারণে নয়, বরং সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা এবং সম্পদ ও শক্তি অর্জন করা"।

এ পর্যায়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আরেকটি বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনার বিষয়ে সতর্ক করেন, যেটাকে তিনি 'সর্বনাশা' বলে অভিহিত করে বলেন ঃ 'যুদ্ধংদেহী অবস্থা আমাদেরকে এক তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্বাভাস দিচ্ছে, যা ক্রমেই (দিনে দিনে) অধিকতর বেগবান হচ্ছে। এমন একটি যুদ্ধের পরিণতি আগামী কয়েক দশক জুড়ে স্থায়ী হতে পারে। স্থায়ী বিকিরণের ফলে বংশ-পরাম্পরা ধরে শিশুরা খুব সম্ভব পঙ্গু হয়ে অথবা জন্ম-সংক্রান্ত ত্রুটি সহ জন্ম নেবে। এ কারণে মানবজাতির জন্যে এ সময়ের এক জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করার জন্যে কাজ করা। বৈশ্যিক-অশান্তির জন্যে কেবলমাত্র মুসলমানদেরকে দোষ দেয়ার পরিবর্তে বিশ্বের বৃহৎ-শক্তিধরদের উচিত একধাপ পিছিয়ে নিজদের দিকে দৃষ্টি ফেরানো। রাজনীতিবিদগণ যাতে মুসলমানদেরকে তাদের দেশে প্রবেশ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করে, সে লক্ষ্যে প্রচার না চালিয়ে বিশ্বে এখন এমন সব নেতা প্রয়োজন, যারা সেসব কাজ করার ব্যাপারে আন্তরিক, যেগুলো আমাদের মধ্যকার বিভাজন দূর করবে"।

উপসংহারে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "বিশ্বের জিম্মাদার হিসেবে বিভিন্ন দেশের সরকার এবং নীতি-নির্ধারকদের উচিত, তাদের দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করা। এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাদের আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত যে, আমাদেরকে যারা অনুসরণ করবে, তারা না পঙ্গু হয়ে জন্ম নেয়, অথবা কোন ভগ্ন-বিশ্বে জন্ম নেয়; বরং স্বাস্থ্যবান ও সুখী হয়ে যেন জন্ম নেয়, এবং এমনই এক

পৃথিবীতে জন্মে, যেটা শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যপূর্ণ"।

এ অনুষ্ঠানটির আগে কানাডায় হুযূর (আই.)কে স্বাগত জানাতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা-র আমীর জনাব মালীক লাল খান কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তার সাথে কানাডার বেশ ক'জন উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাও হুযূর (আই.)কে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হন। তাদের মধ্য থেকে ক্যালগেরীর মেয়র মিঃ নাহিদ নেন্‌শি বলেন ঃ "বিগত ৫০ বছর ধরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কানাডায় বিদ্যমান আছে, আর এ সময়ের মধ্যে এ জামাত মানব-হিতৈষী যেসব কাজ করে আসছে, তার জন্যে আজকের দিনে এ জামাতকে এজন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে, অসহিষ্ণুতা ও হীন-মন্যতার বিরুদ্ধে সম্ভবত অন্য অনেকের চাইতে এ জামাত বেশী যুদ্ধ করে, যা আমাদের সবার জন্যেই মঙ্গলকর। এ জামাত এটা অনুধাবন করে যে, সবাই মিলে গঠিত যে সমাজ, সেটা মূলতঃ প্রতিদিনই আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমৃদ্ধ করে"।

কানাডার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ষ্টিফেন হার্পার বলেন ঃ "প্রধান মন্ত্রী হিসেবে আমার কর্মকালের পুরোটা সময় জুড়েই আহমদীয়া মুসলিম জামাত ছিল আমার উত্তম-সঙ্গীদের অন্যতম, যাদের সাথে আমরা কাজ করেছি। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের আহমদীদের মতোই কানাডার আহমদী জামাতও শান্তি, বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ব-বোধ এবং খোদার ইচ্ছার প্রতি নিষ্ঠা, যা মূলত: সত্যিকার-ইসলামের নীতি এবং শাঁস, তার ধারক হিসেবে সুপরিচিত। আর কেবল কানাডাতেই নয়, বরং বিশ্বের যেখানেই আহমদীগণ বাস করেন, বিভিন্ন উপায়েই তারা মানুষের সেবা করে থাকেন। আহমদী হিসেবে আপনারা যখন কোন প্রকাশ্য-স্থানে দাঁড়িয়ে এ ঘোষনা দেন যে, 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃনা নয় কারো 'পরে', তখন কানাডার সব মানুষের জন্যে অপরিহার্যভাবেই আপনারা একজন সাথী, একজন প্রতিবেশী এবং একজন বন্ধু হয়ে ওঠেন"।

হিউম্যান সার্ভিসেস বিভাগের প্রাদেশিক মিনিষ্টার জনাব ইরফান সাবের বলেন ঃ "বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সমগ্র কানাডা সফরকালে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) যেভাবে এ সাহসিকতাপূর্ণ বাণী– 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে', –ছড়িয়ে যাচ্ছেন, তাতে কানাডাবাসীদেরকে তিনি শান্তি ও সমবেদনা দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছেন"।

সর্বোচ্চ আইন-সভার ফেডারেল সদস্য মিঃ দর্শন ক্যাং বলেন ঃ "আমাদের মধ্যে সেসব লোক, যারা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাথে অবস্থান ও কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে, তারা জানে যে, আহমদী মুসলমানরা কানাডীয় সমাজে কতোটা বিস্ময়কর-অবদান রেখেছেন। মূল্যবোধকে মূর্ত করার ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এক বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত, কানাডাবাসী হিসেবে যেগুলো আমাদের প্রত্যেকেরই খুবই প্রিয়"।

অনুষ্ঠানটি শেষ হবার পর ফার্ষ্ট-ন্যাশনস্ কম্যুনিটির একদল প্রতিনিধি হুযূর (আই.)কে স্বাগত জানান। দেশীয় মুরুব্বীরাও তাদের রীতি মোতাবেক হুযূর (আই.)কে ঐতিহ্যবাহী এক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং এরপর তার সাথে একান্ত এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

হুযূর (আই.) এর সাম্প্রতিক কানাডা সফরে ক্যালগেরী শান্তি-সম্মেলনটিই ছিল হুযূর (আই.)কে দেয়া সর্বশেষ গণ-সংবর্ধনা। এর আগের সপ্তাহগুলোতেও অটোয়ার পার্লামেন্ট-হিলে, ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে, কানাডা শান্তি সম্মেলনে ও মসজিদ উদ্বোধনী-অনুষ্ঠানে এবং লয়েড মিনিষ্টারের সম্মেলনে হুযূর (আই.) মূল-বক্তব্য প্রদান করেন।

মৃত্যু পরবর্তী শোক-প্রকাশ আনুষ্ঠানিক হওয়া উচিত নয়

ফরাসী ভাষা-ভাষীদের সাথে মুলাকাত অনুষ্ঠান Rencontre Avec Les Francophones-এ নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পরে শোক পালন, চল্লিশা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে হুযূর (আই.) বলেন, ইসলামের দৃষ্টিতে কোন শোকই আনুষ্ঠানিক হওয়া উচিত নয়। অনেকে এর বিভিন্ন রীতি বানিয়ে ফেলেছেন; কিন্তু এগুলো ইসলামের অঙ্গ নয়। কোন কোন বর্ণনায় তিন থেকে চল্লিশ দিনের উল্লেখ আছে, যেগুলো খুব সম্ভবত: আত্মার স্থানান্তর ও কবর আযাবের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু তাছাড়া আনুষ্ঠানিক কোন আচারের বিধান নেই। হ্যাঁ, বেশী বেশী দোয়া এবং সম্ভব হলে বা মন যখন বেশী ব্যাকুল হয়, তখন কবরের নিকট গিয়ে যিয়ারত ও দোয়া করার পদ্ধতি রয়েছে।

আর শোক-তো নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বেঁধে দেয়া যায় না। অনেকে তাদের প্রিয়জনের জন্য সারাজীবন শোকে ডুবে থাকেন। তবে এক্ষেত্রেও আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার আর তা হ'ল, শোকেও মধ্যম-পন্থা অবলম্বন করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক সন্তান অসুস্থ্য হয়ে পড়ার পর তিনি চিকিৎসার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করেছিলেন। দোয়াও করেছেন তার জন্যে। সবচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সেই পুত্রের কবরে তিনি কয়েকটি পংক্তি লিখে দেন, যার সারকথা হলো : বড় প্রিয় ছিল, কলিজার টুকরো ছিল... কিন্তু যিনি তাকে নিয়ে গেলেন, তিনি তো আরো প্রিয়।

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান (সিদ্দীকী)
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(১ম কিস্তি)

আমার নাম : মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান (সিদ্দীকী)।

পিতা: মরহুম লুৎফুর রহমান।

দাদা: মরহুম আব্বাস উদ্দীন।

মা : মরহুমা রাবেয়া রহমান।

আমার জন্ম তারিখ: ২৪ চৈত্র, রোয শুক্রবার, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, ৭ই এপ্রিল, ১৯৫০ খ্রী.। আমার আব্বা আমাদের সব ভাইবোনের জন্ম-তারিখ কাগজে লিখে রেখেছিলেন। সেখান থেকে দেখে আমি আমার জন্ম-তারিখ জেনেছি।

জন্মস্থান : গ্রাম-আলাইপুর, পো.-মনিগ্রাম, থানা- বাঘা, জেলা - রাজশাহী।

আমাদের বাড়ি একেবারে পদ্মা নদীর ধারে ছিল। আমরা প্রতিদিন সকালে পদ্মা নদীতে গোসল করতে গিয়ে সাঁতার কাটতাম। সে-কী ভয়ংকর পদ্মা ছিল। বর্ষায় বড় বড় ইলিশ মাছ ধরা পড়ত। আমার মনে আছে, একদিন সকালে নদীর ধারে আব্বার সাথে গেলাম। মাত্র তিন টাকায় ইয়া বড় একটি ইলিশ আব্বা কিনলেন, তাজা ইলিশ। আর এখন সেখানে চর পড়ে গেছে। তারপর পদ্মা পাড়িরা এসে (ভারতীয়) বাড়িঘর করে নিয়েছে। অথচ এগুলো আমাদের জমি ছিল।

আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলাম তখন আমার ছোট মামা মরহুম আব্দুস সোবহান সরকার আমাকে তাদের দাদপুর গড়গড়ি সরেরহাট স্কুলে নিয়ে গেলেন। তিনি সেখানকার প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। প্রাইমারী পাশ করে আমি ১৯৬৩ সালে আড়ানী মনমোহনী হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। সে সময় আড়ানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর ছিল। আজকের বাঘা শহর সে সময় খোলা মাঠ ছিল, যেখানে কোন ঘর বা দোকানও ছিল না। সপ্তাহে কেবল রবিবারে হাট বসতো। সে সময় আমাদের থানা ছিল চারঘাট।

তখন আমি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। শিরাজ ভাই একদিন আমার চুল কাটার সময় আহমদীয়াতের কথা বলেছিলেন। আমি তখন তার কথায় গুরুত্ব দেইনি। এখানেই বলে রাখি, শিরাজ ভাই কুশাবাড়িয়ার একজন বড় পাকা আহমদী মোবাল্লেগ ছিলেন। আহমদী হওয়ার কারণে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে নিরুপায় হয়ে নাপিতের কাজ ধরেছিলেন। খুব কষ্টে কঠোর পরিশ্রম করে সংসার চালাতেন। কিন্তু অনর্গল তবলীগ করতেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়-স্বজন গ্রামবাসী প্রায় তিন'শ অ-আহমদী মোয়াল্লেম আব্দুর রহমান রানু সাহেবের পেছনে জানাযা পড়েছিলেন।

আমি যখন অষ্টম শ্রেণীতে, বন্ধু লোকমান আলী একদিন আহমদীয়াতের তবলীগ শুরু করল। আমি শুনতে থাকলাম। মনে হয় দুই চারটি পুস্তিকাও পড়তে দিয়েছিল। তার মধ্যে "মহাসুসংবাদ" পুস্তিকাটি ছিল। ইতোমধ্যে হাবিল ভাইও যুক্ত হলেন। হাবিবুর রহমানও আহমদী ছিলেন। পরবর্তিতে হাবিল মাস্টার। একবার তারা আমাকে জামাতের মসজিদে জুমার নামায পড়তে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা আড়ানীতে থাকতাম। আমাদের এলাকা থেকে নিকটস্থ জামাত ছিল কাফুরিয়া, যা আড়ানী থেকে প্রায় আট মাইল দূরত্বে ছিল। আর যাতায়াতের জন্য কোন কাঁচা বা পাকা সড়ক ছিল না। এখন তো রোড হয়েছে। বাস চলাচল করে। আমি আহমদীয়াত কবুল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। কন আহমদী হলাম তা বলছি।

আমার আহমদীয়াত কবুল করার কারণ

আমি কোরআন পড়তে জানতাম না। আরবী পড়তে জানতাম না। ফলে আহমদী জামাতের বইসমূহ পাঠ করে আমার কোন উপকার হত না। আহমদীরা বলত আহমদীয়াত সত্য, আর অ-আহমদীরা বলত আহমদীরা কাফের। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কোন্‌টা সত্য? অ-আহমদী আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করা ছিল বৃথা। কেননা, তারা বলবে, আহমদীয়াত মিথ্যা।

আমি ভাবলাম, যদি আহমদী হয়ে জামাতে যোগ দিই, তাহলে সহজেই জানতে পারব আহমদীয়াত সত্য কি-না। যেমন, কোন

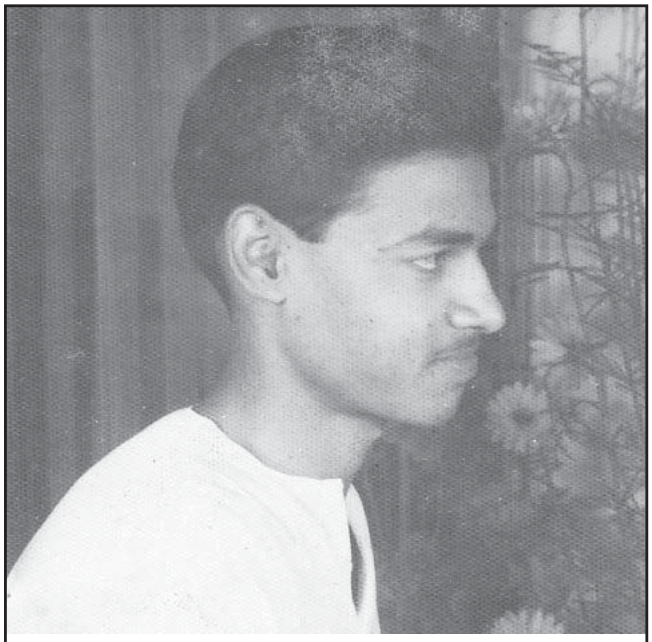

পাকিস্তানে যাবার পূর্বে, ১৯৬৭

বাড়ীর বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে, ভেতরে কি আছে, না আছে। যাহোক, বয়াতের পূর্বে আমি বলেছিলাম, যদি আমি পরবর্তীতে জানতে পারি যে আহমদীয়াত সত্য নয়, তবে আমি জামাত ছেড়ে দিব। একথা শুনে আহমদীরা অবাক হয়ে বললো, এমনটা করবেন না। এমন করলে আল্লাহ নারাজ হবেন। আমি মনে মনে ঠিক করলাম এদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে কাজ নেই। পরে যা হবে দেখা যাবে। আহমদীরা সব কথায় কোরআন আর হাদীস থেকে উদ্ধৃতি দেয়।

আমার মনে হলো, অস্বীকার করাটা ঠিক হবে না। আহমদী বন্ধুরা প্রমাণ দিয়েছিল যে, আহমদী জামাত ইসলামের প্রচার করে থাকে। বাইরের দেশগুলোতে তাদের তবলিগী-মিশন (প্রচারকেন্দ্র) আছে। ইসলামের প্রচার তো সবার আগে গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে। আসলে আহমদীয়াতকে আমি প্রচার-সংগঠন ভেবেছিলাম। আর ভাবলাম, এতো ভালো কথা। আমার মনে হয়েছে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর দাবি সত্য কি-না ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জানতে অনেক পড়াশোনা করা দরকার। মনের মধ্যে ছিল যে, বয়াত করার পর এদিকে মনোযোগ দিব।

আহমদীয়াত সত্য কি-না, এ প্রশ্ন আমার কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা?

কারণ, আমি নামায পড়ি না, ইসলাম কি তা জানি না। আমি ছোটবেলায় নামায পড়তে শুরু করেছিলাম। আমি যখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তাম তখন গোপনে নামায পড়া শুরু করেছিলাম। কারণ এতো ছোট বয়সে নামায পড়তে দেখলে মানুষ হাসবে। আমাদের বাড়ির কাছে কোন মসজিদ ছিল না। সাধারণত মানুষ নামায পড়তো না। বৃদ্ধ লোকেরা অবশ্য বাড়িতে নামায পড়তেন। আমার মনে হয়েছিল, আমি এখন কী এমন ধর্ম পালন করছি যে আহমদী হলে তা নষ্ট হয়ে যাবে?

কখনও কখনও আমাদের গাঁয়ে বা স্কুল-প্রাঙণে ইসলামী-জলসা হত। দূর-দূরান্ত থেকে ওলামাদেরকে আনা হত। আমি তাদের বক্তৃতা মনোযোগের সাথে শুনতাম। তাদের বক্তৃতার ফলে আমার মনে কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছিল, যেগুলোর উত্তর সেসব বক্তৃতায় ছিলোনা। যেমন– প্রথমত: কবরের আযাবের ব্যাপারে। হযরত আদম (আ.) এর সময়ে যারা মারা গেছে, তাদের কবরের আযাব কবে শেষ হবে? আর যারা কেয়ামতের ঠিক পূর্বে মারা যাবে, তাদের আযাব কখন হবে? হলেও অনেক অল্প সময় পর্যন্ত হবে। এটাতো অবিচার।

দ্বিতীয়ত: কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে? মৌলভীদের কাছে গল্প শুনতাম, হযরত রাবেয়া বসরী ও হযরত হাসান বসরীর গল্প। যখন হাসান বসরীর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, তিনি কাঁদতে লাগলেন। মুরিদরা জিজ্ঞাসা করলো আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি তো আউলিয়া, বুযুর্গ মানুষ। আপনার ভয় কিসের? বুযুর্গ উত্তর দিলেন, তোমরা জান না। ঘটনা হলো, যখন আল্লাহ তা'লা মানুষ বানাবার পরিকল্পনা করলেন, আজরাইল (আ.)-কে বললেন, পৃথিবী থেকে মাটি নিয়ে আস। আমি মানুষ বানাব। আজরাইল ফেরেশতা পৃথিবী থেকে দুমুঠো মাটি তুলে এনে আল্লাহর সামনে রাখলেন। আল্লাহতালা ওই দুমুঠো মাটি থেকে মানুষ বানালেন। যেসব মানুষ আজরাইল এর ডান হাতের মাটি থেকে তৈরী, তারা জান্নাতী আর যারা বাঁ হাতের মাটি দ্বারা তৈরী, তারা জাহান্নামী হবে। এখন ওই সুফী-বুযুর্গ একথা ভেবে কাঁদছিলেন যে, তিনি কোন হাতের মাটি দ্বারা তৈরী। তিনি কি জান্নাতী না জাহান্নামী (ইন্নালিল্লাহ)। দুই বৎসর যাবত এইসব চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। তাহলে নামায পড়ে কী হবে?

স্কুলের ইংরেজী শিক্ষা ছেড়ে কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হতে চাইলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। সে লম্বা কাহিনী। তো এরপর আমি নামায পড়া ছেড়ে দিলাম। একদিন মা জিজ্ঞেস করলেন, নামায কেন ছেড়ে দিয়েছ? আমি জবাবে বললাম, কেয়ামতের দিন খোদাকে বলব তিনি কেন আমাকে মাদ্রাসায় পড়ার সুযোগ দেন নি। যদি আমি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেতাম তবে হয়তো আমার জন্য নামায পড়া সহজ হত।

আমি ভাবলাম, যদি আমার ভাগ্যে জান্নাত লেখা থাকে, তো আল্লাহতালা হযরত উমর (রা.)-এর মত আমার জন্যও কোন ব্যবস্থা করবেন। আর যদি জাহান্নাম লেখা থাকে তো নামায পড়ে লাভ কি? বাস্তবে নামাযে মন বসত না। ওই বয়সে

জামেয়ার ছাদে, ইন্দোনেশিয়ান বন্ধুর সাথে লেখক (বামে) ১৯৬৯

জোরপূর্বক নামায পড়া কঠিন হচ্ছিল। সেসময়ে আমি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম।

এই অবস্থায় আহমদীয়াতের সংবাদ পেলাম। তাই আমার জন্য এ প্রশ্ন বেশী গুরুত্ব রাখত না যে, আহমদীয়াত সত্য কি-না। আমি আগেই কোন্ পাক্কা মুসলমান যে, ইমান নষ্ট হবে? হ্যাঁ, আহমদীয়াতে ইসলাম প্রচারের শিক্ষা আছে। কুরআনের আয়াত শোনায়। হতেও পারে যে, আহমদীয়াতের দ্বারা আমার মধ্যে ইমান এসে যাবে। আর সত্যি সত্যিই বয়াত নেবার পর মনে বড় শান্তি পেয়েছিলাম। প্রত্যেক জুমআয় কাফুরিয়া যাওয়া সম্ভব হত না। যেদিন আমরা তিনজন একসাথে যেতাম, সেদিন খুব আনন্দ পেতাম।

বয়াত নেবার পর আমার বড় দুই ভাই, যারা পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তাদেরকে চিঠি লিখলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের রাবওয়াতে আহমদীয়াতের কেন্দ্র। তারা যেন সেখানে যোগাযোগ করেন এবং আহমদীয়াত কবুল করেন। আমার ধারণা ছিল আমার ভাইরা বিচক্ষণ ও ন্যায়-পরায়ন। আহমদীয়াত সম্পর্কে তারা জানেন না। জানতে পারলে নিশ্চয় তারা আহমদীয়াত কবুল করবেন। বড় ভাই ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান কোন উত্তর দিলেন না। আর মেঝভাই আনিসুর রহমান লিখলেন, তওবা কর। নতুবা, তোমার পড়াশোনার খরচ বন্ধ করে দেয়া হবে। সেঝ ভাই শামসুর রহমান আমার সাথে ছিলেন। আমার চেয়ে একবছর সিনিয়র। তিনি পরামর্শ দিলেন আপাতত আহমদীয়াতের বিষয়ে বাড়িতে কাউকে কিছু জানিও না। যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবে তখন যা হয় করো। যাহোক, ভাইদের সাথে বিতর্ক করা বন্ধ করে দিলাম। আহমদীয়াতের সাথে যোগাযোগ রাখলাম, কিন্তু কাউকে কিছু জানালাম না।

একদিন জুমার নামাযে মসজিদে গেলাম। একটি পুস্তিকার পেছনে বিজ্ঞাপন দেখলাম, যেখানে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর তাহরিক ছিল। আহমদী যুবকেরা যেন ইসলামের প্রচার কাজে জীবন উৎসর্গ করে। কেউ যদি জীবন উৎসর্গ করে, তাকে জামেয়া আহমদীয়ায় পড়বার জন্য রাবওয়া যেতে হবে। ব্যাস, আমি আমার গন্তব্য পেয়ে গেলাম। আমি কোরআন পড়তে চেয়েছিলাম, আর ধর্মীয়-জ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছিলাম। এর জন্য যে মূল্যই দিতে হয় দিব। এখানে আমার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের বিরাট সুযোগ, ইসলাম প্রচারের সুযোগ তো নিশ্চিত বাড়তি-পাওনা।

এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর রাবওয়া যাবার চেষ্টা শুরু করে দিলাম। ইতোমধ্যে "কিশতিয়ে নূহ" পড়লাম। আহমদীরা বলত, যে কিশতিয়ে নূহ পড়েনি সে আহমদী হয়নি। এ বইতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ বান্দাদের সাথে কথা বলেন। মানে খোদা দোয়া শোনেন আর উত্তরও দেন। আজও আমি রোমাঞ্চিত হই! আমার খুবই অবাক লাগে, লোকে এদিকে মনোযোগ দেয় না কেন? দুনিয়াতে এর চেয়ে অবাক বিস্ময় আর কি আছে যে, খোদা বান্দার সাথে কথা বলেন! যদি খোদা সত্যিই বান্দার ডাকে সাড়া দেন তো আমাকে প্রথমে চেষ্টা করে দেখতে হবে যে, সত্যি কি খোদা কথা বলেন? সাড়া দেন কি-না। আর কিভাবে সাড়া দেন? এখন জীবনের সবকিছু ভুলে আমি এদিকে মনোযোগ দিলাম যে, আল্লাহ যেন আমার দোয়া কবুল করেন আর আমি রাবওয়া যেতে পারি, জামেয়াতে ভর্তি হই। কোরআন-হাদীস শিখে ইসলামের প্রচারকে জীবনের উদ্দেশ্য বানাই। কাহিনী অনেক লম্বা। সংক্ষেপে বলি, রাবওয়া যাওয়া আমার জন্য অনেক কঠিন, বলা যায় অসম্ভব ছিল।

আহমদীরা সবাই বলতে লাগলেন, তুমি রাবওয়া যেও না। ও বড় কঠিন কাজ। বড় বড় আহমদীদের ছেলেরা গিয়ে ফেরত এসেছে। তুমি তো ধর্মীয়-বিষয়ে কিছুই জান না। অতএব, তুমি যেওনা। যারা জামেয়ায় ভর্তি হয়ে পরে ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসে তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে কোন কাজের যোগ্য থাকে না। সুতরাং রাবওয়া যাবার পূর্বে আল্লাহতা'লাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার যে যাওয়া ঠিক হবে কি-না। কিন্তু, খোদা স্বয়ং হাত ধরে আমাকে রাবওয়া পৌছে দিলেন, যেখানে হযরত সৈয়দ মীর দাউদ সাহেবকে পেলাম। হযরত মালেক সাইফুর রহমান সাহেব মুফতি সিলসিলা, হযরত মালেক মুবারক আহমদ সাহেব, মোহতরম কুরাইশী নুরুল হক সাহেব তানভীর, মোহতরম মুহাম্মদ আহমদ সাহেব জলিল, মহতরম মুহাম্মদ আহমেদ

মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সাথে, জামেয়ার উস্তাদ মালেক মোবারক আহমদ মাঝে বসা, বামে মাহমুদ আহমদ সাহেব ও লেখক ডানে

সাকেব এবং মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব এর মত শিক্ষকেরা ছিলেন এবং ছাত্রদের মধ্যে অনেক বুযুর্গ-ছাত্রকে বন্ধু হিসেবে পেলাম। আর পিতার মত পেলাম হযরত মির্যা নাসের আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) কে। মৌলভী মুহাম্মদ সাহেব মরহুম তৎকালীন আমীর সাহেবকে আল্লাহ তালা উত্তম পুরষ্কারে ভূষিত করুন যিনি আমাকে রাবওয়া পাঠিয়েছিলেন।

১৮ই নভেম্বর, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ, সোমবার জামেয়ার হোস্টেলে পৌছে গেলাম। ১৯৬৯ বা ১৯৭০ সালের সালানা জলসায় বাঙ্গালীদের সাথে সাক্ষাতের সময়ে খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বাংলাদেশের আমীর মৌলভী মুহাম্মদ সাহেবকে আমার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। মৌলভী মুহাম্মদ সাহেব জানালেন নতুন আহমদী হয়েছে। হযরত সাহেব বললেন, "এ তো আমাদের ঘরের একজন"। সুবহানাল্লা আল্লাহু আকবর! আমি বিস্মিত হলাম। কেননা, এর আগে মাত্র এক কি দুইবার হুযুরের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। তাও কথা বলতে পারিনি। সে যুগে সপ্তাহে একদিন রবিবার হুযুরের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হতো। বড়রা বা দূর থেকে যারা আসতেন, তারা আগে দেখা করার সুযোগ পেতেন। সাক্ষাতের সময়ের শেষে জামেয়ার ছাত্রদেরকে একসাথে বসানো হত। হুযুর কথা বলতেন আর আমরা শুনতাম। ছাত্রদের মধ্য থেকে কেউ কেউ কথা বলত বা প্রশ্ন করত। আমি সবসময় চুপচাপ বসে হুযুরকে দেখতাম। কথা বলতে পারতাম না। যাই হোক, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। অতএব, আমার ধারণা ছিলো, হুযুর আমাকে চিনেন না। এখন এমন কথা শুনে আশ্চর্য্য হলাম। হুযুর কেন এমন বললেন। তবে এখন পযর্ন্ত সবসময় হুযুর (রাহে.)-এর কথার সত্যতা অনুভব করি, আলহামদুলিল্লাহ।

আহমদীয়াত গ্রহণের পটভূমি

আমি মুরুব্বী হয়ে জামাতের খেদমতে ব্যস্ত থাকতাম। মাঝে মাঝে ভাবতাম যে, আল্লাহ আমাকে কেন আহমদী, আহমদী মোবাল্লেগ বানালেন? আমি প্রতিবাদী মানুষ ছিলাম। সহজে কারো কথা মানতাম না। কারো কথা মান্য করা একান্ত জরুরী বলে মনে করতাম না। তবে কারো সাথে অযথা ঝগড়াও করতাম না।

১৯৬৬ সালে ছাত্ররা জোর করে আমাকে আড়ানী হাইস্কুলের ছাত্রদের জেনারেল সেক্রেটারী বানালো। অবশ্য ভোটের মাধ্যমে। যদিও ভোট পাওয়ার জন্য আমি কিছুই করি নি। সব বন্ধুরা করেছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, একবার সবাই চাপ সৃষ্টি করে স্কুলে হরতাল ডাকাল। হেডমাস্টারকে চলে যেতে হবে। আমার স্মরণ আছে চারদিন স্কুলে ক্লাস হতে দিলাম না। চতুর্থ দিন রাজশাহী থেকে সংসদ সদস্য জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান সাহেব আসলেন। যিনি বাংলাদেশের প্রথম সরকারের (মুজিবনগর সরকার) মন্ত্রী ছিলেন। ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ জেলহত্যার ঘটনায় তিনি শহীদ হন। আমাকে একেবারে তাঁর সামনে বসালেন। কোন চেয়ার টেবিল ছাড়া স্কুলের বাইরে রাস্তার উপর। বুঝিয়ে মিমাংসা করালেন। হরতাল প্রত্যাহার করা হল। অবশ্য রাবওয়া যাবার পরে আমি ক্ষমা চেয়ে হেডমাস্টার সাহেবকে চিঠি দিয়েছিলাম। ভাল নাম সম্ভবত: আজের উদ্দীন ছিল। আজের মিয়া বলতো সবাই। তিনি ক্ষমা করে পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন। আমার ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেটও তিনিই আমাকে ডাক যোগে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমাকে পূর্ব থেকে খুব আদর করতেন। তাই হরতাল করাতে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন।

সুতরাং আমি চিন্তা করলাম, আমি কি করে আহমদী হলাম। আমার আব্বা খুব সাধারণ দরিদ্র কৃষক ছিলেন। সামান্য কিছু জমি ছিল। বাল্যকালে আমার দাদা আব্বাস উদ্দীন মারা যান। ফলে আব্বা লেখাপড়া করতে পারেন নি। তার লেখাপড়ার খুব আগ্রহ ছিল। বাংলা পড়তে পারতেন। সে যুগে মেয়েদের লেখাপড়ার নিয়ম ছিল না। আমার নানা আব্দুর রহমান সরকার তার তিন মেয়েকে লেখাপড়া করান নি। স্কুলও ছিল না। মামারা ছোট ছিলেন। তারা লেখাপড়া করেছিলেন।

আমার বড়খালু সাহেব নিজের উদ্যোগে প্রাইমারী স্কুল আরম্ভ করেছিলেন। যখন সরকারী কর্মকর্তা স্কুল পরিদর্শনে এসে স্কুল অনুমোদন করলেন, তখন খালু সাহেবের বেতন ধার্য হয়েছিল মাসে আড়াই টাকা। কথা লম্বা হয়ে গেল। আসল কথায় আসি।

আল্লাহ আমাকে কেন আহমদী করলেন। আমার ধারণা, হয়তোবা খুব ছোটকাল থেকেই আমি মনে মনে আল্লাহর সন্ধান করতাম। খোদা তা'লাই আমার মনে তা সৃষ্টি করেছিলেন। দু'একটি ঘটনা বলছি।

১. আমার বয়স পাঁচ ছয় বছরের বেশী ছিল না। আমার মনে পড়ে, যখন জোরে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হতো, আব্বা বারান্দার খুঁটি ধরে বা বারান্দার খড়ের ঘরের চাল ধরে জোরে আযান দিতেন। শুধু আমার আব্বা না- গ্রামের সবাই। তাদের বিশ্বাস আযান দিলে ঘরের চাল উড়ে যাবে না। সে যুগে অনেক সময় সব ঘরবাড়িই উড়ে যেত। আমি আশ্চর্য্য হতাম, আযান দিলে ঘর উড়ে যাবে না, আল্লাহ বাঁচাবে? এ কেমন কথা! আল্লাহ কে, কী, কীভাবে কি করেন? কোথায় থাকেন?

কল্পনা করতাম, লোহার মোটা খুঁটি হলে তো ঘর পড়ার ভয় ছিল না। তারপর জানলাম, ভূমিকম্প হলে নাকি লোহার খুঁটি পড়ে যাবে। এ তো মহা মুশকিল! কেবল খোদা বাঁচাতে পারেন! তাহলে তো খোদা সম্পর্কে জানা দরকার!

২. অষ্টম শ্রেণীতে পড়তাম। ধর্মীয়-মাদ্রাসায় পড়ার খুব জোশ সৃষ্টি হল। একজন মৌলভী সাহেবের বক্তৃতা শুনে তাঁর প্রতি খুবই আগ্রহ সৃষ্টি হল। আমাদের আড়ানী হাইস্কুলে বার্ষিক জলসায় তিনি এসেছিলেন। খোঁজ করে জানলাম, তিনি নওগাঁ শহরে মাদ্রাসার শিক্ষক। স্কুলে গরমের লম্বা ছুটি হয়ে গেল। কাউকে না জানিয়ে নওগাঁর উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠে বসলাম। বিকালবেলা নওগাঁ পৌঁছলাম। ঐ ট্রেনের গন্তব্য ঐ পর্যন্তই। অতএব, ট্রেন ফেরত চলে আসল। আমি মাদ্রাসার খোঁজে হাঁটতে থাকলাম। অনেক খুঁজে মাদ্রাসা পেলাম। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য, মাদ্রাসাও বন্ধ দীর্ঘ গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখন কি করি? এক খাবার হোটেলে গেলাম। বললাম, কিছুকাল হোটেলে চাকরী করতে চাই। থাকা খাওয়া হোটেল মালিক দিবেন। খাওয়া দাওয়া করলাম। মালিক বললেন, তুমি মনে হয় কোন ভদ্র ঘরের ছেলে। পালিয়ে এসেছো মা বাবার উপর রাগ করে। চাকরী তুমি করতে পারবে না। রাতে এখানে থাকো। কাল সকালে ট্রেন আসলে ফেরত চলে যেও। আমি সকালে ট্রেন ধরে চলে আসলাম। তাকে কিছু বললাম না। কাউকে ঐ যাত্রার কথা জানালাম না।

প্রত্যেক হাইস্কুলে ঐ যুগে একজন মৌলভী শিক্ষক থাকতেন। ইসলামীয়াত পড়াতেন। উর্দূও পড়াতেন। মৌলভী সাহেবের বাড়ি ছিল চাঁদপুর জেলায়। সেদেশে অনেক মাদ্রাসা। মৌলভী সাহেবকে বললাম, আমাকে আপনার এলাকায় নিয়ে কোন ভাল মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দিন। তিনি বললেন, মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা ভাল না। তুই পারবি না। তারপর তোর বাবা এসে জিজ্ঞেস করলে আমি মিথ্যা বলতে পারবো না। তুই মাদ্রাসার চিন্তা ছেড়ে দে।

বড় ভাই, মেজো ভাই পাকিস্তানে আর্মিতে ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন। তাদেরকে বললাম, মাদ্রাসায় ভর্তি হতে চাই। মেজ ভাই বললেন ছুটিতে বাড়ি এসে মাদ্রাসা দেখে ভর্তি করাবেন।

কিন্তু আমার সম্পর্কে আব্বাকে লিখলেন যে, কোন মৌলভী আমাকে বিভ্রান্ত করছে। আপনারা তাকে বুঝিয়ে দেন যে, আমরা আমাদের ভাইকে মৌলভী বানাতে চাই না, যারা মানুষের রুটি এনে খেয়ে জীবন যাপন করবে। আমরা এটি সহ্য করতে পারবো না। সে যুগে মৌলভীদের অবস্থা এমনই ছিল। নিয়মিত বেতনও ছিল না। আমি হতাশ হয়ে রাগ করে নামায পড়া বন্ধ করলাম।

এর কিছুদিন পরই আহমদীয়াতের পয়গাম পেলাম। আহমদীয়াত সত্য কী-মিথ্যা যাচাই করা সহজ ছিল না। আমি তো কুরআন পড়তেও জানতাম না। সত্য যাচাই করার জন্য অনেক পড়াশোনা করা দরকার। সত্যের সন্ধান করছিলাম। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমার মাথায় আসলো যে, সত্য মিথ্যা যাচাই করার সহজ উপায় আহমদী হয়ে জামাতে প্রবেশ করে অনুসন্ধান করা। এ কথা কখনো কাউকে বলতে ইচ্ছা করত না, আল্লাহর ভালবাসার কথা বলে বেড়ানো শরমের কথা। ভয়ও হয়, কখন আল্লাহ নারাজ হন। আমি চাই না কেউ আমাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করুক। আহমদীয়াত লাভ করা আমার কোন বিশেষ গুণ বা যোগ্যতার বিষয় নয়। শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে আমি যেমন প্রতিবাদী মানুষ ছিলাম হয়তো আহমদী-বিরোধীদলে যোগ দিয়ে বড় বিরোধী হয়ে যেতে পারতাম। কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই। ভয় হচ্ছিল, এসব কথা প্রকাশ করা ঠিক হবে কি-না। রাবওয়ার ছাত্র-জীবনে ১৯৭৪ সালে আহমদী বিরোধী আন্দোলনের সময় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। সেখানকার ঘটনাগুলো হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আইঃ) এর খেদমতে লিখে পাঠিয়েছিলাম। তিনি লিখলেন- " আপনি কারাবাসের যে ঘটনাগুলো লিখেছেন, নির্দ্বিধায় প্রকাশ করুন। এখানে অনেক ভাল ঘটনা রয়েছে। জাযাকুমুল্লাহ। আল্লাহ তা'লা এ প্রকাশনাকে সবদিক থেকে কল্যাণমন্ডিত করুন আর পাঠকগণকে এর থেকে উপকৃত হবার সামর্থ্য দান করুন। আমীন।"

আমি অ্যাডিশনাল উকিলে ইশায়াতকে দেখালাম। তিনি আমার জামেয়ার সমসাময়িক এবং খুব আন্তরিক। তিনি বললেন, "আপনার তো আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড রয়েছে সেগুলোও লিখুন। আমি এ কথা হুযুর (আই.)-কে জানালাম। আমি দেশে ফেরত আসার আগের দিন হুযুর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তখনও হুযুর নিজ থেকে আবার বললেন, ' আমি লিখে দিয়েছি, আপনার ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করুন।' এভাবে হযুর (আই.)-এর নিজ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক নির্দেশের কারণে পাক্ষিক 'আহমদী'তে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। সবার কাছে বিশেষ দোয়ার আবেদন। আল্লাহ তা'লা যেন আমাকে (কবুল) গ্রহণ করেন, আপন করে নেন। সকলেরই উচিৎ এমন চেষ্টা করা, খোদা যেন তাকে আপন করে নেন।

(চলবে)

মাহে রমযানে ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব

নাজির আহমদ ভূঁইয়া

আমরা জানি রমযানুল মুবারকের দিনগুলোতে ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এবং এ মাসের দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে বিশেষ ভাবে গৃহীত হয়।

সূরা বাকারার ১৮৭ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

"এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার সঙ্গে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।"

এ আয়াতের প্রথম অংশের **'ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নি ফাইন্নি কারীব'** ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের খলীফা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা রসূলকে সম্বোধন করে বলেন, হে আমার রসূল! যেভাবে প্রেমিক জিজ্ঞেস করতে থাকে তার প্রেমাস্পদ কোথায়, সেভাবে আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে এবং জিজ্ঞেস করে আমাদের খোদা কোথায়, তখন তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমরা ঘাবড়াবে না, আমিতো তোমাদের একেবারেই নিকটে আছি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এ আয়াতাংশে **'ইবাদি'** অর্থাৎ 'বান্দারা' বলতে আল্লাহ্ তা'লার প্রেমিকদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি আমার বান্দাদের নিকটে থাকার প্রমাণ হলো, **'উজিবুদ্‌দা ওয়াতাদ্দায়ে ইযা দাআন'** অর্থাৎ- কোন ব্যক্তি যখন ভীষণ অস্থিরতার সাথে ও ব্যাথাতুর চিত্তে আমার কাছে দোয়া করে তখন আমি তার দোয়া কবুল করে থাকি। এতেই প্রমাণিত হয় আমি তার নিকটে আছি। আমি যদি দূরেই থাকতাম তাহলে তার সিজদারত অবস্থার মৃদু আওয়াজ কিভাবে শুনতে পেতাম? এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেই কুরআন করীমের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষের যে জীবন শিরা রয়েছে, আমি এরও অধিক নিকটে রয়েছি।

কোন কোন লোক এ আপত্তি উত্থাপন করে থাকে যে, আমরা তো অনেক আবেগ নিয়ে দোয়া করেছি, কিন্তু আমাদের দোয়া কবুল হয়নি। এর উত্তরে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে এ আয়াতাংশের 'আসারে' শব্দটির একটি অর্থ যেকোন প্রার্থনাকারীও বটে। কিন্তু এ শব্দটির একটি অর্থ হলো এমন প্রার্থনাকারী, যে কেবল আল্লাহ্‌র নৈকট্য চায়, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায় এবং কেবল আল্লাহ্‌কেই চায় এবং অন্য সবকিছু ভুলে কেবল আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হতে চায়, আল্লাহ্ অবশ্যই তার দোয়া কবুল করেন এবং তাকে তাঁর নৈকট্য দান করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে, 'তারা তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে'। এতে হালুয়া-রুটী, চাকরী-বাকরী বা জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলা হয়নি। আয়াতাংশে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য চায়, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে তা দান করে থাকেন।

এক্ষেত্রে অন্যদের আপত্তি করার কোন অবকাশ নেই। এ কথাটি আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের অন্যত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য পূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে, আমরা আমাদের সত্তার কসম খেয়ে বলছি, আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথের দিকে আসার সামর্থ দান করে থাকি।

আল্লাহ্‌র কাছে মানুষ অনেক কিছু চেয়ে থাকে। সব বস্তুর মাঝেই কল্যাণ ও অকল্যাণ নিহিত থাকে। আলেমুল গায়েব খোদা অর্থাৎ অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদা জানেন কোন বান্দার জন্য কোন বস্তুটি কল্যাণকর এবং কোনটি অকল্যাণকর। বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে যে দোয়াই করতে থাকুক না কেন তার জন্য অকল্যাণকর বস্তু আল্লাহ্ তাকে দেন না এবং দিতেও পারেন না। তাছাড়া কোন কোন বস্তুর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ধরুণ চাকুরী একটি, কিন্তু চাকুরীর-প্রার্থী ২০ জন। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ ২০ জনের দোয়া শুনবেন না, কেবল একজনের দোয়াই শুনবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র সত্তায় কোন সীমাবদ্ধতা নেই এবং তাঁকে চাওয়ার মাঝে কোন অকল্যাণ নেই বরং এতে কেবল বান্দার জন্য কল্যাণ আর কল্যাণই রয়েছে। কাজেই যারা কেবল আল্লাহকেই চায় তাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। মোদ্দা কথা, মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ধর্মে প্রবেশ করে। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত খোদাকে পাওয়া। যে আয়াতাংশ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, তাতে এ কথাই বলা হয়েছে।

দোয়া কবুল হওয়ার প্রথম-শর্ত হলো, **'ফালইয়ান তাজিবু লি'** অর্থাৎ- দোয়াকারীরাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেক্ষেত্রে আমি তোমাদের কথা শুনি এবং তোমাদের দোয়া কবুল করি, সেক্ষেত্রে তোমাদের উচিত তোমরাও এমনটি হয়ে যাও, যাতে করে

আমি তোমাদের দোয়া কবুল করতে পারি তোমরা এমন দোয়া করো না যা আমার সুন্নত বিরোধী। অর্থাৎ, আমার বিধানের পরিপন্থী। তোমরা এমন দোয়া করো না যা নৈতিকতার পরিপন্থী। তোমরা এমন দোয়া করো না, যাতে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে অন্যের ক্ষতি সাধন করতে চাও। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোন চোর যদি চুরি করতে যাওয়ার পূর্বে ২ রাকাত নফল নামায পড়ে এ দোয়া করে, হে আল্লাহ্! আমি যেন ধরা পড়ে না যাই। আল্লাহ্ কী এ জাতীয় দোয়া শুনবেন? কখনো শুনবেন না। কারণ এগুলো নৈতিকতা-পরিপন্থী। কেউ যদি তার সন্তানের মৃত্যু হয়ে গেলে এই দোয়া করে, হে আল্লাহ্! আমার সন্তানের প্রাণ ফিরিয়ে দাও। আল্লাহ্ এ দোয়াও শুনবেন না। কারণ এমন দোয়া আল্লাহ্‌র বিধানের পরিপন্থী। আবার কেউ যদি হিংসার বশে এ দোয়া করে আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তি আমার শত্রু, তাকে ধ্বংস করে দাও। আল্লাহ্ এমন দোয়াও শুনবেন না। কারণ এরূপ দোয়াও নৈতিকতা বিরোধী। নাজায়েজ দোয়া আল্লাহ্ কখনো শুনেন না। আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত নীতিমালার মধ্যে থেকে দোয়া করলে আল্লাহ্ সে দোয়া কবুল করেন।

দোয়া কবুলিয়তের দ্বিতীয়-শর্ত হলো, আল্লাহ্‌র প্রতি দোয়াকারীর পূর্ণ-ঈমান থাকতে হবে। তাকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্ দোয়া শোনেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে না আল্লাহ্ কীভাবে তার দোয়া শুনবেন? হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, আমি এমন ব্যক্তির জন্য বেশি দোয়া করি, যে এসে আমাকে বলে তার জন্য দোয়া করার আর কেউ নেই। সে আমার ওপর দৃঢ় আস্থা রাখে বলেই আমি তার জন্য বেশি দোয়া করি। আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

দোয়ার কবুলিয়তের ক্ষেত্রে আরো একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। দোয়ার ক্ষেত্রে অনেকে খুব জলদী করে অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে। আর এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল না হলে সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে এবং দোয়া ছেড়ে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, দোয়ার ক্ষেত্রে তোমরা কখনো হতাশ হবে না। বরং আমার প্রতি ঈমান রেখে দোয়া করতেই থাকবে। এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি কথা আমার মনে পড়ছে। তিনি (আ.) বলেন, মনে কর, মাটির ২০ ফুট গভীরে পানি আছে। কেউ যদি ১০/১৫ ফুট মাটি খুঁড়ে পানি না পেয়ে হতাশ হয়ে বসে পড়ে, সে কি কখনো পানির নাগাল পাবে? দোয়ার ক্ষেত্রেও তা-ই। যতক্ষণ পর্যন্ত দোয়া কবুল না হয় আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কাকুতি-মিনতি ভরে দোয়া করেই যেতে হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'লায়াল্লাহুম ইয়ার শুদুন'। এ জাতীয় দোয়ার ফলে অবশ্যই সে সফল হবে।

সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতের শেষাংশ 'লায়াল্লাহুম ইয়ার শুদুন' (অর্থাৎ যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়) এর ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সঠিক পথ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লাকে বান্দার নিকটে আসতে হয়। কিন্তু সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার পর বান্দাদের মাঝে এমন শক্তির সৃষ্টি হয় যে তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র নিকটে আসতে পারে। প্রথমে 'ইন্নি কারীব' বলে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে তিনি তাদের নিকটে আসছেন কিন্তু তিনি **'ইয়ারশুদুন'** বলে এ কথা বুঝাচ্ছেন যে, উন্নতি করতে করতে বান্দাদের মাঝে এক ধরণের খোদায়ী গুণ সৃষ্টি হয়ে যায়। পূর্বে তাদের দৃষ্টান্ত এমন ছিল যেন দৃষ্টিহীন ব্যক্তির কাছে তার বন্ধু বসে ছিল। কিন্তু এরপর তারা এরূপ উন্নতি করে যেন এখন চক্ষুষ্মানের সামনে তার প্রেমিক বসে আছে। এটাই সেই অবস্থা, যার সম্পর্কে রসূল করীম (সা.) বলেন, ইবাদতের সময় প্রত্যেক মানুষকে এটা অনুভব করা উচিত যেন সে খোদা তা'লাকে দেখছে অথবা অন্তত সে এ কথা মনে করে যে খোদা তাকে দেখছেন।

এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আরও বলেন, যেহেতু সূরা বাকারার আলোচ্য ১৮৭ আয়াতের পূর্বেও এবং এর পরেও রোযার কথা বলা হয়েছে তাই এ আয়াতের মাধ্যমে মু'মিনদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করা হয়েছে যে, এমনিতে তো আল্লাহ্ তা'লা সদা সর্বদাই তার বান্দাদের দোয়া শুনে থাকেন এবং তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন, কিন্তু তিনি রমযানুল মুবারকের দিনগুলোতে কবুলিয়তে দোয়া অর্থাৎ দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এজন্য হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, তোমরা এ দিনগুলো থেকে কল্যাণ লাভ কর এবং খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা কর। রমযানের মাসেও যদি তোমরা খালি হাতে থেকে যাও, সেটা হবে তোমাদের দূর্ভাগ্য।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আরো বলেন, পৃথিবীতে প্রত্যেক কাজ এর সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করলে উত্তম ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সে কাজ অন্য সময়ে করলে কোন ফল লাভ হয় না। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেক প্রকারের শস্য ও শাক সব্জির বীজ বপনের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। সেই নির্দিষ্ট সময়ের পর বীজ বপন করলে কোন ফল হবে পাওয়া যাবে না। বাংলা-প্রবাদে একেই বলে, সময়ে এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন, 'ইত্তাকু দাওয়াতাল মজলুম' অর্থাৎ অত্যাচারিতের বদ্ দোয়াকে ভয় কর। কেননা সে যখন চারিদিকে কষ্ট আর কষ্টই দেখতে পায় এবং খোদা তা'লাকে ছাড়া অন্য কোন আশ্রয়-স্থান দেখতে পায় না তখন তার সব মনোসংযোগ খোদা তা'লার দিকেই নিবদ্ধ হয় এবং সে খোদা তা'লার দরবারে সিজদাবনত হয়। সেই সময় সে যা-ই দোয়া করে তখন তা কবুল হয়ে যায়। এভাবেই মানুষের জন্য দোয়া কবুল হওয়ার একটি বিশেষ সময়ও রয়েছে এবং তা হলো রমযান মাস। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সূরা বাকারার আলোচ্য ১৮৭ আয়াতে খোদা তা'লা রমযানের সাথে সম্পর্কিত বলে বর্ণনা করেছেন। এথেকে জানা যায়, রোযার সাথে এ আয়াতের অতি গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং রোযার সাথে এ আয়াত বর্ণনা করার কারণ এটাই যে, যেভাবে মানুষের সব মনযোগ সীমাবদ্ধ হয়ে এক দিকেই অর্থাৎ খোদা তা'লার দিকেই নিবদ্ধ হয়ে যায়, সেভাবেই মাহে রমযানে মুসলমানদের মনযোগ খোদা তা'লার দিকেই নিবদ্ধ হয়ে যায়।

রমযানের ইবাদত সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আরো একটি গভীর তত্ত্ব উদঘাটন করেছেন। তিনি বলেন, রমযান মাসে মুসলমানদের একটি বড় অংশ রাতে উঠে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে থাকে। এরপর সেহরীর জন্য সবাইকে উঠতে হয় এবং

সেই সময় তারা সবাই ইবাদতের কোন না কোন সুযোগ পেয়ে যায়। এ সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের দোয়া যখন খোদা তা'লার দরবারে পৌঁছে যায় তখন খোদা তা'লা তা কবুল করেন। মু'মিনদের এ বেদনা-ভরা দোয়া খোদা তা'লা অবশ্যই শুনে থাকেন। এ জাতীয় সমবেত দোয়ার ফলেই আল্লাহ্ তা'লা ইউনুস (আ.)-এর জাতিকে ক্ষমা করেছিলেন এবং তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেছিলেন। এর কারণ এটিই ছিল যে, তারা সবাই একত্র হয়ে খোদা তা'লার দরবারে সিজদাবনত হয়েছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আবারো বলেন, রমযান মাস দোয়া কবুলিয়তের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। এটা সেই মাস, যাতে দোয়াকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা 'কারীব' অর্থাৎ 'নিকটবর্তী' হওয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি নিকটবর্তী থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি তাঁকে না পায়, তবে সে তাঁকে আর কবে পাবে? বান্দা যখন খোদাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং তার আমল দিয়ে প্রমাণ করে দেয় যে, সে এখন খোদা তা'লার দুয়ার ছেড়ে আর কোথাও যাবে না তখন তাঁর কল্যাণের সব দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হয় এবং 'ইন্নী কারীব' অর্থাৎ আমি নিকটে আছি–এ আওয়াজ সে তার নিজ কানেও শুনতে পায়। এর অর্থ এটাই যে, খোদা তা'লা সব সময় তার সাথে আছেন। কোন বান্দা যখন এই মাকামে পৌঁছে যায়, তখন তাকে বুঝতে হবে সে খোদাকে পেয়ে গেছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, খোদাকে পাওয়াই রমযানের ইবাদতের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁর 'সায়রে রূহানী' পুস্তকে জান্নাত সম্পর্কে এক গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। সে বিষয়টি এখানে উল্লেখ্য। তিনি বলেন, তিন ধরনের লোক জান্নাত লাভ করবে। প্রথমত সেসব লোক জান্নাত লাভ করবে, যারা সারা জীবন কেবল জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করেছে। দ্বিতীয়ত সে সব লোক জান্নাতে যাবে, যারা সারা জীবন জান্নাত লাভের জন্য দোয়া করেছে। তৃতীয়ত সে সব লোক জান্নাতে যাবে, যারা সারা জীবন ধরে কেবল আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার জন্য দোয়া করেছে। এ তিন শ্রেণীর দোয়াকারীর মাঝে নিঃসন্দেহে শেষোক্ত শ্রেণীর দোয়াকারীরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সর্বোত্তম। কারণ এরাই প্রকৃত আল্লাহ্-প্রেমিক।

এ ব্যাপারে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, শহরে চাকুরীরত কোন প্রবাসী ছেলে যখন মায়ের ভালবাসায় গ্রামের বাড়ীতে তার সাথে দেখা করতে যায়, তখন তার মা তার জন্য স্নেহের ভান্ডার উজার করে দেয় এবং সব রকমের ভাল ভাল খাবার তাকে খেতে দেয়। কোন নির্বোধ ছেলে যদি ভালবাসার তাগিদে নয় কেবল মায়ের একান্ত স্নেহ লাভের জন্য এবং ভাল খাবারের লোভে মায়ের কাছে যায় তবুও তার মা তাকে স্নেহ করবে এবং ভাল ভাল খাবার খেতে দিবে। এ উদাহরণ টেনে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সারা জীবন যারা আল্লাহ্ প্রেমে মগ্ন, তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি কামনা করেছে, তারাতো এমনিতেই জান্নাতে যাবে। এ জন্যই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কত সুন্দর ভাবেই না বলেছেন, আমাদের খোদাই আমাদের বেহেস্ত। তাঁর মাঝেই আমাদের সকল আনন্দ। রোযার মাসের ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীও এমনটিই হওয়া উচিত।

আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা আপাদমস্তক পাপে নিমজ্জিত এবং পাপের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাদের জন্যও মাহে রমযানে আশার বাণী রয়েছে।

সূরা আয্-যুমারের ৫৪ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

"কুল ইয়া ইবাদীয়াল্লাযীনা আছরাফু আলা আনফুছিহিম। লাতাকনাতু মির রাহমাতীল্লাহি। ইন্নাল্লাহা ইয়াগফেরুজ্জুনুবা জামীয়া। ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহীম।"

এ আয়াতের অর্থ হলো , তুমি বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতিব ক্ষমাশীল (ও) পরম দয়াময়। এ আয়াতে পাপীদের জন্য আশা ও আনন্দের বাণী রয়েছে। আমি এ আয়াতের আর অধিক ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন মনে করি না।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর ইনতিকালের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯০৭ সালের সালানা জলসায় বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন, "এ ধারণা করোনা, আমরা পাপী, আমাদের দোয়া কি করে গৃহীত হবে। মানুষ ত্রুটি করে। কিন্তু দোয়ার কল্যাণে সে অবশেষে কু-প্রবৃত্তির ওপর জয়ী হয়ে থাকে এবং কু-প্রবৃত্তিকে পদদলিত করে দেয়। কেননা, খোদা তা'লা মানুষের মাঝে এ শক্তি রেখে দিয়েছেন যেন সে কু-প্রবৃত্তির ওপর জয়ী হয়ে যায়। দেখ, পানির স্বভাবে এটা রয়েছে যে তা আগুনকে নিভিয়ে দেয়। সুতরাং পানিকে যতই গরম করনা কেন, এমনকি আগুনের ন্যায় কর, তবুও এ পানি যখন আগুনের ওপর পড়তে থাকে তা অবশ্যই আগুনকে নিভিয়ে দিবে। এভাবে পানির স্বভাবে নিভানোর শক্তি নিহিত হয়েছে। তেমনই মানুষের স্বভাবে পবিত্রতা নিহিত রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্রতার উপকরণ নিহিত রেখেছেন। এ ব্যাপারে ভয় পেয়োনা যে তোমরা পাপে নিমজ্জিত। পাপ সেই ময়লার মত, যা কাপড়ে থাকে এবং দূর করা যায়। কু-প্রবৃত্তির আবেগে তোমাদের স্বভাব যতই ভরপুর হোক না কেন খোদা তা'লার কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাক। তিনি তোমাদের বিফল করবেন না। তিনি পরম সহিষ্ণু। তিনি পরম ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কেউ কেঁদে কেঁদে দোয়া করলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিফল করেন না। অতএব, এ মাহে রমযানের পবিত্র দিনগুলোতে আমাদের উচিত, আমরা যেন গভীর রাতের অন্ধকারে উঠে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে একান্ত নিভৃতে নির্জনে অতীব বেদনা ভরা হৃদয় নিয়ে এবং অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে দোয়া করতে থাকি। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের চোখের পানি আমাদের সব পাপ ধুয়ে মুছে আমাদেরকে নব জীবন দান করবে।

(তথ্য সূত্র ঃ তফসীরে কবীর প্রথম খন্ডের বাকারার ঃ ১৮৭ নং আয়াতের তফসীর)

রমযানের মাসলা-মাসায়েল

মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ, বাংলাদেশ

(১ম কিস্তি)

পবিত্র রমযানে রোযার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে "লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন"। রোযার বিধান এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, রোযা রাখার ফলে রোযাদারের হৃদয়ে যেন আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত হয়। সে যেন উত্তম থেকে উত্তম আখলাক অর্জনের মাধ্যমে দেশ ও দশের খেদমত করতে পারে। নিষ্ঠা আর একাগ্রতার সাথে মহান সৃষ্টিকর্তার ইবাদত-বন্দিগীর মাধ্যমে নিজকে ইহজগতেই জান্নাত লাভের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

রমযানের রোযা আদায় করার পরেও যদি কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় জান্নাত লাভের আলামত পরিলক্ষিত না হয়, তবে বুঝতে হবে যে, তার রোযা আদায়ের মাঝে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি লুক্কায়িত রয়েছে, অথবা সে রোযার মর্মাথ না বুঝে শুধুমাত্র পানাহার বর্জন করে দিনাতিপাত করেছে। রোযার মাধ্যমে মানব হৃদয়ে পরিবর্তন সাধন করতে হলে সর্বপ্রথম রোযার মর্মাথ উদঘাটন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত: জানা রোযার সঠিক মাসলা-মাসায়েল বা নিয়ম-কানুন জানা প্রয়োজন। আমার ন্যায় নাদান ব্যক্তির পক্ষে রমযানের মর্মাথ উদঘাটন করা সম্ভব নয়। তাই আসন্ন রমযানকে সামনে রেখে রোযার মাসলা-মাসায়েল বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি।

(১) প্রথমেই আলোচনা করছি বছরের অন্য কোন মাসের পরিবর্তে রমযান মাসকেই কেন রোযার জন্য নিদিষ্ট করা হয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তরে পবিত্র কুরআন করীমে বলা হয়েছে। "রমযান সেই মাস, যে মাসে নাযীল করা হয়েছে বিশ্ব-মানবের দিশারী এবং সত্য-পথের স্পষ্ট-নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী কুরআন" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)। মসীহে মাওউদ হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন: 'আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে 'রময; বলা হয়। যেহেতু রমযানে রোযাদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ-বিলাস হতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পালনের উদ্দেশ্যে স্বীয় প্রাণে ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, সেজন্য আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযানের রোযার বিধান আরোপিত হয়েছে' (আলহাকাম)। তিনি (আ.) আরো বলেন। "কোন কোন দার্শনিকের ধারণা যে, রোযা সর্বপ্রথম গ্রীষ্মকালে শুরু হয়েছিল বলেই এর নাম রমযান রাখা হয়েছে। এহেন ধারণা কল্পনা-প্রসূত এবং রোযার মৌলিক-দর্শনের পরিপন্থী। কেননা, আরবী পঞ্জিকা মোতাবেক চাঁদের হিসাবে গণনা করা হয়। আরবী মাসগুলো বাংলা বা ইংরেজী মাসের ন্যায় একই ঋতুতে আবর্তিত থাকে না। ইহা বিভিন্ন ঋতুর আবর্তে আবর্তিত হয়ে থাকে। অতএব বলা যেতে পারে, বাহ্যিক পরিবর্তন আধ্যাত্মিক-পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে সমন্ধ যুক্ত। কেননা, চন্দ্র মাসের হিসাবে রমযান ঘুরে ফিরে প্রত্যেক ঋতুতেই এসে থাকে" (আল হাকাম)।

(২) রমযান মাসে কুরআন খতমের উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপের কারণ কি?

বিশ্ব মানব সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে মুসলিম-মিল্লাতের জাগতিক ও পারোলৌকিক মুক্তির মহাসনদ হচ্ছে পবিত্র কুরআন যা পবিত্র রমযান মাসেই প্রথম নাযীল হওয়া আরম্ভ হয়েছিলো। মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রত্যেক সদস্য-সদস্যার উচিত, বছরের প্রতিটি দিন গভীর মনোনিবেশ সহ ভাবার্থ বুঝে শুনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও এর আদেশ নিষেধের উপর আমল করা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের সবচেয়ে উত্তম সময় সম্বন্ধে সূরা বনী ইসরাইলে ৭৯ আয়াতে বলা হয়েছে– "তুমি প্রভাতে কুরআন তেলাওয়াত কর, প্রভাতে

কুরআন পাঠ (আল্লাহ্‌র নিকট) নিশ্চয়ই গ্রহণীয়"। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, 'প্রতি বছর রমযান মাসে হযরত জীবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট বছরের অন্যান্য সময়ে এবং পূর্বে যতখানি কুরআন নাযীল হতো, পবিত্র রমযানে তার পুনরাবৃত্তি করা হতো। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের শেষ রমযানে হযরত জীবরাঈল (আ.) তাঁর (সা.)-এর নিকট দুইবার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কুরআন আবৃত্তি করেন'।

(৩) রমযান মাসে পাঁচ ওয়াক্ত বাজামাত নামায আদায় সহ তারাবীর নামায আদায় করার পরেও কি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতে হবে?

তাহাজ্জুদ নামায সমন্ধে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "এবং তুমি গভীর রজনীতে উঠে এর দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর, (ইহা) তোমার জন্য নফল স্বরূপ, ইহাতে আশা করা যায় যে, তোমার প্রভূ তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয়-মর্যাদায় উন্নীত করবেন" (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৭৯) হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন। 'হে লোকেরা! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, অনাহারীকে আহার করাও এবং রাতে লোকজন যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তাহাজ্জুদ নামায আদায় কর তবেই নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে'। তাহাজ্জুদ নামায মানুষকে আধ্যাত্মিকতার চুড়ান্ত-মার্গে উপনীত হতে সাহায্য করে আর জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা প্রদান করে। সুতরাং যারা বুদ্ধিমান, তারা রমযানে পাঁচ ওয়াক্ত বাজামাত নামায আদায়ের পরেও গভীর রজনীতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে থাকেন।

(৪) রমযানের রোযা রাখা কাদের জন্য ফরয?

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "এবং কেহ অসুস্থ থাকলে অথবা সফরে থাকলে অন্য সময়ে ঐ সংখ্যা পূর্ণ করবে। তোমাদের জন্য যা সহজ, আল্লাহ্‌ তাই চান এবং তোমাদের জন্য যা কষ্টদায়ক, তা চান না" (সূরা বাকার-১৮৬)। পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াত হতে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম মিল্লাতের প্রতিটি সুস্থ-সবল প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর জন্য রমযানে রোযা রাখা ফরয। গর্ভবতী মহিলা, যে মহিলার বাচ্চা বুকের দুধ পান করে, চির-রোগী, অতিশয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যাদের পক্ষে ক্ষুধা, পিপাসা সহ্য করা কষ্টকর, মুসাফির এদের জন্য রোযা ফরয নয়। আল্লাহ্‌ রহমানুর রাহীম এদের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "আর যারা (রোযা রাখার) সার্মথ্য রাখেনা, তাদের জন্য ফিদিয়া (রূপে) একজন দরিদ্রকে খাওয়ানো (বাধ্যতামুলক করা) হলো" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫) হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন। 'আল্লাহ্‌ তা'লা মুসাফির হতে অর্ধেক নামায এবং মুসাফির, স্তন্য দানকারিনী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক হতে (আপাতত) রোযাকে উঠিয়ে নিয়েছেন' (আবু দাউদ)।

(৫) যদি সফর অবস্থায় কোন ব্যক্তি রোযা রাখে তবে সে রোযাও কি পরে আদায় করতে হবে?

পবিত্র কুরআনে সফর অবস্থায় রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা সফর অবস্থায় রোযা রাখে তারা আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার ফলে অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে। হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলে করীম (স.) একদা সফরে ছিলেন। এক স্থানে মানুষের ভীড় দেখলেন, যেখানে এক লোকের ওপর ছায়া দেওয়া হচ্ছে। হুযূর পাক (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কী হচ্ছে? লোকেরা বললো, 'এক রোযাদার'। হুযূর (সা.) বললেন, সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়' (বুখারী)।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলে করীম (স.) বলেছেন– 'আল্লাহ্‌ তা'লা মুসাফির হতে অর্ধেক নামায এবং মুসাফির, স্তন্য দানকারিনী-মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক হতে (আপাতত) রোযাকে উঠিয়ে নিয়েছেন' (আবু দাউদ)। মুজ্জাদ্দেদে আযম মসীহে মাওউদ, ইমাম মাহদী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন– 'পবিত্র কুরআন করীম হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অসুস্থ ও সফরকারী ব্যক্তির রোযা রাখা উচিত নয়। এটা আল্লাহ্‌র আদেশ। আল্লাহ্‌ তা'লা এরূপ নির্দেশ দেননি যে, রোযা যার ইচ্ছা রাখুক অথবা যার ইচ্ছা না রাখুক। যেহেতু অধিকাংশ লোক সফরে রোযা রেখে থাকে; সেহেতু যদি তারা প্রচলিত প্রথা বিবেচনা করে রোযা রাখে, তবে তারা রাখুক কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কুরআন করীমের আদেশ, অন্য সময়ে সেই রোযা পূর্ণ করতেই হবে, এর প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।' (আল হাকাম, ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯৬)

(৬) বছরের কোন্‌ কোন্‌ দিন রোযা রাখা নিষেধ?

(ক) বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসুলে করীম (স.) বলেছেন– 'তোমাদের কেউ যেন রমযানের একদিন বা দুইদিন পূর্বে রোযা না রাখে। তবে যে ব্যক্তির ঐদিন গুলোর রোযা রাখার অভ্যাস হয়ে গেছে সে যেন ঐদিন গুলোতে রোযা রাখে'।

(খ) হযরত ওমর (রা.) বলেন, 'নবীয়ে করীম (সা.) আমাদেরকে ঈদুল ফিতরের দিন ও এর পরের দিন এবং ঈদুল আযহার তিন দিন রোযা আদায় করতে নিষেধ করেছেন' (মুসলিম)।

(গ) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসুলে করীম (সা.) বলেছেন– 'তোমাদের কেউ যেন শুধুমাত্র জুমআর দিনে রোযা না রাখে। যদি রাখতে চায়, তবে যেন জুমআর পূর্বে বা পরে একদিন যোগ করে রোযা রাখে' (মুসলিম)

(ঘ) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা ছিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলে পাক (সা.) একবার মহিলাদেরকে নসিহত করলেন– 'স্বামীদের অনুমতী ব্যতীত

নফল রোযা রাখবে না' (বুখারী, মুসলিম)।

(৭) পবিত্র রমযান মাসে বেশি বেশি দান-খয়রাত করা সম্পর্কে রসূলে পাক (সা.)-এর নির্দেশ কি?

অভাব-গ্রস্ত মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রদানের জন্য পবিত্র কুরআনে বার বার জোড়ালো তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। রমযান মাস মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জন করার মাস। এ মাসে মুসলিম জাহানের ধনী-গরীব সবাই ইবাদতে মশগুল থাকেন। এ মাসটি দোয়া কবুলিয়তের মাস। সমাজের গরীব-দুঃখী মানুষ-জনের প্রতি যারা কিঞ্চিত পরিমাণ অনুগ্রহ করেন, তাদের জন্য তার প্রাণ আল্লাহ্‌র দরবারে উজাড় করে দোয়া করেন। সমাজে যারা অভাবী, আল্লাহ্ তাদের হাত খালি ফিরান না।

সুতরাং ধনীদের উচিত, নিজের প্রয়োজনেই রমযানে দানের হাতকে বছরের যে কোন সময়ে অপেক্ষা বেশী প্রসারিত করা। সমজের অভাবী মানুষের মুখে হাঁসি ফোটানোর ব্যবস্থা হিসাবে সাদকা, যাকাত, ফিদিয়া, ফিতরানা সহ নানারূপ মালী কুরবানীর আদেশ পবিত্র কুরআনে প্রদান করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) ব্যক্ত করেন, হযরত রসুলে করীম (সা.) ছিলেন লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশী দানশীল, আর বিশেষ করে রমযান মাসে তাঁর দানশীলতা আরো বেড়ে যেতো। হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন তাঁর সাথে দেখা করতেন, তিনি তাঁকে প্রতি রাতে কুরআন শিক্ষা দিতেন। হযরত জীবরাঈলের আগমনে রসূলে করীম (সা.)-এর দানের মাত্রা বৃষ্টি আনয়নকারী বাতাস অপেক্ষা কল্যাণকামী হয়ে উঠত' (বুখারী)।

(৮) রোযা দ্বারা মানবাত্মার কী কল্যাণ সাধন হয়ে থাকে?

মসীহে মাওউদ হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন: 'পানাহারে দেহ শক্তিশালী হয় আর রোযার মাধ্যমে পানাহার বর্জনের ফলে আত্মা শক্তিশালী হয়। পার্থীব পানাহারকে যিকরে এলাহী দ্বারা পরিপূর্ণ করতে হয়। কারণ যিকরে এলাহীই আত্মার আসল খোরাক। অধিক মাত্রার জাগতিক আহার-বিহার আর ভোগ-বিলাসে আত্মার মৃত্যু হয় এবং রোযার মাধ্যমে যিকরে এলাহীতে মৃত-আত্মা জাগ্রত, সতেজ ও ঐশী-বলে বলীয়ান হয়ে উঠে' (আল হাকাম)। মুসলেহ্ মাওউদ, খলীফাতুল মসীহ সানী, হযরত মীর্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) বলেন– 'সারাটা বছরে আমাদের শরীরে যে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বিষ জমা হয়, তা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা রমযানের এক মাস রোযা রাখার বিধান আরোপ করেছেন। রোযা না রাখার ফলে বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বাড়তেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য এবং দৃষ্টিহীনতা সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ্ তার সামনে এলেও তাঁকে সে চিনতে পারে না' (আল ফযল ১৯-১২-১৯৬৫)।

(৯)। সেহেরী খাওয়ার সময় রসুলে করীম (সা.)-এর সুন্নত বা নিয়ম কি ছিলো?

এসব বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার সুযোগ নেই, যা বলার বা করার তা হযরত মুহাম্মদ (স.) পবিত্র কুরআনের আয়াত "তোমরা আহার কর এবং পান কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট সাদা রেখা থেকে কালো রেখা পৃথক বলে বিবেচিত হয়" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৮) এর আলোকে সমাধান প্রদান করেছেন। হুযূর পাক (স.) বলেছেন, 'তোমরা রমযানে সেহেরী খাও, কেননা সেহেরীর মাঝে বরকত রয়েছে', (মুসলিম)।

বুখারী শরীফে বলা হয়েছে, 'রসুলে করীম (স.)-এর সেহেরী খাওয়া আর ফযরের নামাযের আজানের মাঝে পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করার সময় অবশিষ্ট থাকতো। মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে, রসূলে করীম (সা.) হযরত বেলালের আযান শুনে সেহেরী খাওয়া বাদ দিতে বারন করেছেন। কেননা, হযরত বেলাল (রা.) রাত থাকতেই আযান দিয়ে দেয়'।

(১০) সেহেরী না খেয়ে রোযা রাখা যায় কি?

রোযা রাখার জন্য সেহেরী খাওয়াটা জরুরী। কেননা, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'আমাদের ও কিতাবীদের (বনী ইসরাঈলীদের) রোযার পার্থক্য হলো সেহেরী খাওয়া' (মুসলিম)। তবে কেউ যদি সময়ের অভাবে বা ভুলক্রমে সেহেরী খেতে না পারেন, আর এর ফলে রোযা রাখলে তার স্বাস্থগত কোন জটিল সমস্যা সৃষ্টি না হয়, তবে রোযা রাখা যেতে পারে বলে আলেমগণ মনে করেন।

(চলবে)

সংবাদ

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন জামাত ও হালকায় মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

মিরপুর

বিগত ১লা মে, ২০১৭ রোজ সোমবার বাদ আসর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সভা মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম বি, আকরাম আহমদ খান চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের, মোয়াল্লেম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর। এরপর আরবী কাসিদা পাঠ করেন ইফতে খায়রুল ইসলাম ও তার দল এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। মাগরিবের নামাজের বিরতির পর সভার কাজ পুনরায় শুরু হয় এবং উর্দু নযম পাঠ করেন কাদিয়ান থেকে আগত মেহমান মাওলানা সাফির আহমদ শামীম, মুরুব্বী সিলসিলাহ কাদিয়ান। "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম জীবন আদর্শ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন, মুরুব্বী সিলসিলাহ। আগত জেরে-তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ। সিরাতুন্নবী (সা.) সেমিনারে প্রায় ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন জেরে তবলীগসহ চার শতাধিক উপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিত মেহমানদের মধ্য থেকে ৬ জন জেরে তবলীগ বয়আত করেন, আলহামদুলিল্লাহ। সেমিনারটি রাত প্রায় ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত চলে। সেমিনার শেষে মেহমানসহ সকলকে আপ্যায়ন করা হয়। মোহতরম আমীর সাহেবের সমাপ্তি-বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন

মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা

গত ১৫ এপ্রিল, ২০১৭ শনিবার বাদ আছর থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মজলিস আসারুল্লাহ্, ঢাকার উদ্যোগে দারুত তবলীগ মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ, যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা। পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা জনাব আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এবং জনাব শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন, মুরুব্বী সিলসিলাহ। সভাপতির অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব নাসির উদ্দিন মিল্লাত, নায়েব যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা। উক্ত সভায় আহমদী ও মেহমানসহ ৭৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন; এর মধ্যে জেরে তবলীগ ছিলেন ১৮ জন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব হাফেজ আজিজুর রহমান। এরপর নযম পাঠ করেন শহিদুল ইসলাম খোকন সাহেব। প্রথম বক্তা

মুরুব্বী সিলসিলাহ্ জনাব নুরুল আমিন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতির ওপর কুরআন হাদীস এর আলোকে বিশদ বক্তব্য পেশ করেন। দ্বিতীয় বক্তা মোবাল্লেগ ইনচার্জ জনাব আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর উত্তম-চরিত্রের ওপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। এতে আগত মেহমানদের পক্ষ থেকে যেসকল প্রশ্ন করা হয়, মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব অত্যন্ত ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে সেসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা।

শফিকুল হাকিম আহমদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঘাটুরা

গত ০৩/০৫/২০১৭ তারিখ রোজ বুধবার বাদ মাগরীব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী, নায়েব সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। এতে প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব এস.এম.ইব্রাহীম এবং নযম পাঠ করেন এস.এম.নঈম উল্লাহ্। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনীর উপর বক্তৃতা করেন রিজিওনাল নাযেম (বি.সি) জনাব মোশারফ হোসেন, শামসুদ্দিন মাসুম, মুরব্বী সিলসিলাহ। সবশেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মুছা মিয়ার সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

খলিলুর রহমান

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন জামাত ও হালকায় মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত

নাটাই

গত ০২-০৩-২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নাটাই এর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নাটাই। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব সানাউল করিম বাবু এবং নযম (বাংলা) পরিবেশন করেন জনাব এস.এম তাফহীম বেলাল। প্রথম বক্তা হিসেবে ছিলেন, জনাব মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ আলক, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সরাইল। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল খেলাফত বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বক্তব্য। ২য় বক্তা ছিলেন জনাব হাসেম উল্লাহ্ শিকদার। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও তার খেলাফতের শ্রেষ্ঠ অর্জনসমূহ। তিনি তার বক্তৃতায় খেলাফতে সানিয়ার যুগে মুসলমানদের যে অসাধারণ সেবা ও খেদমত করা হয়েছে, তা ইতিহাস এর আলোকে এবং ভারতের নামীদামী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতির আলোকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। সর্বশেষ বক্তা ছিলেন প্রধান অতিথি মোহতরম মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া সাহেব মোয়াল্লেম আ. মু. জা. ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সর্বশেষে সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মনতাজ উদ্দিন আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্, তেবাড়িয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২৭/০২/২০১৭ তারিখে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত করেন শাকিলা আনোয়ার এবং নযম পাঠ করেন নিলুফার ইয়াসমিন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বাল্যকাল সম্পর্কে বক্তৃতা করেন বিনতে ইয়াছমিন এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বপ্না মোস্তারী। এরপর যৌথ ভাবে নযম পরিবেশন করেন নাসেরাতদের মধ্য থেকে সুপ্তা ও নাবা। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সার্বিক আলোচনা করেন লাকী আহমদ, প্রেসিডেন্ট (লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়া)। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

লাকী আহমদ

কৃতী ছাত্র

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে আমার বড় ছেলে জনাব আব্দুল বাসেত এবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা-২০১৬ সালে GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চগড় জেলা স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে একজন ওয়াকফে নও। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং সে যেন দ্বীনের খেদমতকারী হয়, এজন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করছি।

দোয়াপ্রার্থী
মোহাম্মদ আব্দুল মতিন
মুরব্বী সিলসিলাহ্, আহমদনগর

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন জামাত ও হালকায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর

গত ২৩ মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিষ্ণুপুর তাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে 'মসীহ মওউদ দিবস' পালন করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার বিষ্ণুপুর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অঙ্গসংগঠন মজলিস আনসারুল্লাহ বিষ্ণুপুর মসীহ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য ও নান্দনিক আলোচনা সভার আয়োজন করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওনাল মজলিসের নায়েম মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে মুহাম্মদ কামরুজ্জামান কর্তৃকপবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যয়ীম, বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাপ্তাহিক প্রতাপ-এর সম্পাদক ও প্রকাশক আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া, মোয়াল্লেম আবদুস সালাম,কবি আলমগীর কলিন প্রমুখ। গত বৃহস্পতিবার বাদ যোহর এ অনুষ্ঠান স্থানীয় মসজিদ ফজলে অনুষ্ঠিত হয়।

আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া

সিলেট

গত ২৪ মার্চ-২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত সিলেট স্থানীয় প্রেসিডেন্ট-এর বাসাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতি ছিলেন ইকবাল চৌধুরী সাহেব এবং প্রধান অতিথি মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন, জোনাল-ইনচার্জ, সিলেট। সভায় প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন আরাফ মোহাম্মদ এবং বাংলা নযম পাঠ করেন মাহমুদ আহমদ কায়েদ সিলেট। বক্তৃতা পর্বে প্রথম আলোচনা করেন জনাব বদরুল ইসলাম। তিনি দিবসটির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। এরপর প্রধান অতিথি মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের বিস্তারিত বিষয়ে আলোকপাত করেন। সবশেষে সভাপতি সাহেব তার আলোচনায় দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরেন। পরিশেষে খাকসার পরিচালিত ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করে।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

রাজশাহী

গত ২৩ মার্চ, ২০১৭ তারিখ বাদ মাগরিব মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আতাউর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব তারেক আহমদ চৌধুরী। এরপর উর্দু নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ ইমরান হোসেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্ববর্তী জীবন-এর ওপর বক্তব্য প্রদান করেন আলহাজ্জ রেজাউল করিম। 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা'-এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন জনাব তৌকির আহমদ চৌধুরী। এরপর জনাব জি. এম. সিরাজ উদ্দিন বাংলা নযম পেশ করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অবদান সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন মুরব্বী সিলসিলা মাওলানা মোহাম্মদ সালাহ্ উদ্দিন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন জনাব আতাউর রহমান দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মোহাম্মদ আতাউর রহমান

কেরালকাতা

গত ২৩ মার্চ রঘুনাথপুরবাগ জামাতের হালকা কেরালকাতায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব রেজাউল ইসলাম এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন সোহাগ আহমদ এবং নযম পাঠ করে খাকছার। এরপর হযরত আকদাস ইমাম মাহ্দী (আ.) আগমনের উদ্দেশ্য- এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাওলানা খোরশেদ আলম, মুরব্বী সিলসিলাহ এবং হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তৃতা করেন এস, এম, মাহমুদুল হক মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। এরপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ২২ জন আহমদী উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

বগুড়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বগুড়া এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বগুড়ার যৌথ আয়োজনে গত ২৩/০২২০১৭ তারিখ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরবি মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হামিদ এর সভাপতিত্বে সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটে মাগরিবের নামাযের পর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে

তা রাত্রি ৮টা পর্যন্ত চলে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, মসীহ মাওউদ (আ.)-এর গভীর মানব-প্রেম ও ভালবাসা, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম বিশ্বাস ও বয়আতের শর্তসমূহ নিয়েও বক্তারা আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি কর্তৃত দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। মোট ৪৫ জন সদস্য-সদস্যা এতে উপস্থিত ছিলেন।

আবুল কালাম আজাদ

মুন্সীগঞ্জ

গত ২৩/০৩/২০১৭ তারিখ বাদ ফজর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মুন্সিগঞ্জ-এর আয়োজনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মীম আব্দুল ওয়াছে এবং নযম পাঠ করেন জনাব মুরসালিন আহমদ কায়েদ। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাল্য জীবনের ওপর বক্তৃতা করেন জনাব মীর আব্দুল ওয়াছে। পরিশেষে জনাব আরিফ আহমদ সাহেব পরিচালিত দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪ জন খোদ্দাম ও ৫ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

মীর আব্দুল ওয়াছে

ফাজিলপুর জামাত

গত ২৪/০৩/২০১৭ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব নূর এলাহী জসিমের সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে প্রথমে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মাগফুর আহমদ। নযম পাঠ করেন জনাব ইমতিয়াজ আহমদ। ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ওপর আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ রেজওয়ানুল হক খান, জেনারেল সেক্রেটারী।

এ ছাড়াও হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব সাইফুল ইসলাম, ফাইনান্স সেক্রেটারী। ইমাম মাহ্দী (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, স্থানীয় মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি করা হয়।

ফাজিলপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্

০৭/০৪/২০১৭ তারিখ বাদ জুমুআ মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খান যয়ীম সাহেবের সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব সাইফুল ইসলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, স্থানীয় মোয়াল্লেম। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খান। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩ জন মেহমানসহ জামাতের সকল সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

চড়াইখোলা

গত ২৩/০৩/২০১৭ তারিখ বাদ মাগরীব মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন প্রামাণিক, প্রেসিডেন্ট চড়াইখোলা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব শরীফুল ইসলাম এবং দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। দোয়ার পর মসীহ্ মাওউদ সংক্রান্ত স্বরচিত নযম পাঠ করেন জনাব জামাল উদ্দীন প্রামাণিক। এরপর মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয় কেন? এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন আমজাদ হোসেন চৌধুরী সাহেব। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উত্তম চারিত্রিক দিক বিষয় নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব তোফাজ্জল হোসেন সাহেব। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব ইমরান আহমেদ সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন। এরপর সভাপতি সাহেব সমাপনী বক্তৃতা ও ইমাম মাহ্দীর রসূল-প্রেম সম্পর্কে বলেন দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ ইমরান আহমেদ

কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

আমাদের ছেলে ফারুক আহমদ ও মেয়ে লামিয়া আক্তার (তানিয়া) ২০১৬ সনের প্রাইমারী ৫ম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষায় কোড্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কৃতিত্বের সাথে জি, পি-এ-৫ এবং সরকারী বৃত্তি পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

এটি আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ এবং আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় হুযূর (আই.)-এর নেক ও পবিত্র দোয়ারই ফল। ভবিষ্যতে জীবন চলার পথে লেখাপড়া, জাগতিক এবং আধ্যাত্মিকতার সকল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হতে পারে এবং ঐশী খেলাফতের জন্য সর্বোত্তম 'জীবন উৎসর্গকারী' হিসেবে মহান আল্লাহ্ যেন এই দুই ভাই বোনকে গ্রহণ করেন সেই প্রত্যাশায় আহমদী ভ্রাতাভগ্নি সকলের নিকট খাস ভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম,
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ
ও **বেগম শেফালী হাকিম**

আনসারুল্লাহ মিরপুর-এ সায়েক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আল্লাহ তা'লার অশেষ ফজলে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭ রোজ মঙ্গলবার মজলিস আনসারুল্লাহ মিরপুর-এর সায়েক সম্মেলন মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। নবনিযুক্ত ২৪ জন হালকা সায়েকের হাতে-কলমে প্রশিক্ষনের জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে হালকা সায়েকগণ ছাড়াও মজলিস এর সাত হালকার যয়ীমগণ, হালকা নিগরানকারীগণ এবং মজলিসে আমেলার অন্যান্য সদস্যরাও এতে অংশগ্রহণ করেন। নায়েব সদর মোহতরম গোলাম কাদের সাহেব এর সভাপতিত্বে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার পর সম্মেলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্থানীয় যয়ীমে আলা জনাব আবু জাকির আহমদ। তিনি হালকা সায়েকগণের দায়িত্বাবলী এবং তাদের মাসিক রিপোর্ট প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব ইমতিয়াজ আলী সাহেবও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। তিনি নিয়মিত ব্যক্তিগত তবলীগের উপর গুরুত্বারোপ ও তবলীগের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের কায়েদ উমুমী জনাব নঈম আলম খান এবং ঢাকা বিভাগীয় নাযেম আলা জনাব মিজানুর রহমান। সভাপতি সাহেব তার বক্তব্যে সায়েক সম্মেলন আয়োজনের প্রশংসা করেন এবং আন্তরিকতার সাথে মজলিসের কাজে সকলের অংশগ্রহণ এবং হালকা সদস্যদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের খোঁজ-খবর নেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

আবু জাকির আহমদ

আশকোনা মজলিসে ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা

গত ৬ ও ৭ এপ্রিল ২০১৭ইং রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দুইদিন ব্যাপী ৪র্থ বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা আশকোনা মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। ৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাদ আসর পতাকা উত্তোলন করেন মজলিসের কায়েদ ও স্থানীয় হালকা প্রেসিডেন্ট সাহেব। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কায়েদ জনাব মিরাজ উদ্দিন আহমেদ। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সাব্বাউদ্দিন সালমুন। বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মৌলবী এনামুল হক রনি এরপর আহাদপাঠ করেন কায়েদ জনাব মিরাজ উদ্দিন আহমেদ ও দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব তোফাজ্জল হোসেন সাহেব। বিকেল ৫.৩০ টা হতে ৬.৩০ টা পর্যন্ত আতফালের খেলাধুলা প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ৬.৩০-৬.৪৫ মাগরিব ও ইশা নামাজ জমা করা হয়। এর পর ৭.০০-৯.৩০ টা পর্যন্ত আতফালের কুরআন ও নযম প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। তারপর ৯.৩০-১০.৩০ পর্যন্ত খোদ্দামদের কুইজ ও পয়গামে রেসানী (দলগত) প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ১০.৩০ ঘটিকায় রাত্রের খাবার পরিবেশন করা হয়। ১১.০০ টায় নিদ্রা যাপন। রাতে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা হয়। এরপর চলে ব্যক্তিগত কুরআন পাঠ ও বিশ্রাম। ৭.০০-৮.০০ সকালের নাস্তা ৮.০০-৯.০০টা খেলাধুলা। ৯.০০-১০.০০ টা লিখিত পরীক্ষা। ১০.০০-১১.০০টা বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। ১১.৪৫-১২.১৫ ওয়াকারে আমল করা হয়। ১২.১৫-২.৩০ জুমুআর নামায ও খাবার বিরতী। ২.৩০-৪.০০ টা পর্যন্ত চলে খোদ্দামদের কুরআন তেলাওয়াত ও নযম প্রতিযোগিতা। ৪.০০-৫.৩০ পর্যন্ত সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান করা হয়। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় মজলিসের কায়েদ জনাব মিরাজ উদ্দিন আহমেদ। এখানে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আউসাফ আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব তাসভীর আহমদ। এরপর নসিহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন জনাব তোফাজ্জল হোসেন হালকা প্রেসিডেন্ট সাহেব ও জনাব মৌলবী এলামূল হক রনি শোকরানা জ্ঞাপন করেন জনাব শমসের আলী দিদার সেক্রেটারী ইজমেতা কমিটি। উক্ত ইজতেমায় রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী হাজিরা খোদ্দাম ৩৭ জন আতফাল ২২জন, মোট ৫৯ জন। এছাড়া সাহযোগীতার জন্য আনসার ছিলেন ৭জন, সর্বমোট ৬৬ জন হাজির ছিলেন। সবশেষে কায়েদ সাহেব আহাদ পাঠ করান এবং মোয়াল্লেম সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি হয়।

মিরাজ উদ্দিন আহমদ

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন

হুযূর(আই.)-এর ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের খুতবার আলোকে প্রস্তুতকৃত

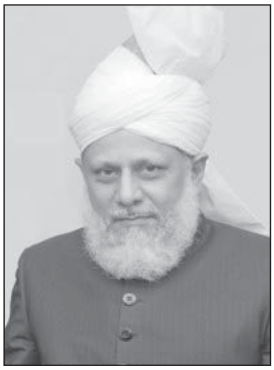

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.)

১। আমরা কি বয়াতের ১০টি শর্ত গত বছর যথাযথভাবে পালন করেছি?

২। আমরা কি শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পেরেছি?

৩। আমরা কি লৌকিকতামুক্ত আমল করতে পেরেছি? অর্থাৎ মানুষকে খুশি করার জন্য নয় কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য কাজ করতে পেরেছি?

৪। আমরা কি প্রবৃত্তির সুপ্ত লালসা ও বাসনামুক্ত আমল করতে পেরেছি?

৫। আমাদের নামায, রোযা ও সদকা-খয়রাত ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, মানবসেবার যাবতীয় কাজ বা ঐশী জামাতের কাজে প্রদত্ত সময় কি কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছিল? নাকি এসব নিছক লৌকিকতা এবং মানুষকে খুশি করার জন্য আমরা করেছি?

৬। আমাদের মনের সব সুপ্ত-বাসনা খোদাপ্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি তো?

৭। গত বছরটি আমরা কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা পরিহার করে এবং সত্যে অবিচল থেকে অতিক্রান্ত করেছি?

৮। আমরা কি নিজের ক্ষতিসাধন করে হলেও সর্বাবস্থায় সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করতে পেরেছি?

৯। মনের মাঝে নোংরা ও অশ্লিল চিন্তাধারার উদ্রেক করে– আমরা কি নিজেদেরকে এমন সব আয়োজন ও অনুষ্ঠান থেকে বিরত রেখেছি?

১০। টিভি, ইন্টারনেটে পরিবেশিত অথবা এমনসব অন্যান্য অনুষ্ঠান যেগুলো দেখলে অন্তরে নোংরা চিন্তাধারা জন্ম নেয় আমরা কি এসব পরিহার করতে পেরেছি? (যদি এর উত্তর 'না' হলে আমাদের অবস্থা বড়ই করুণ)

১১। আমরা কি কুদৃষ্টি নিক্ষেপের বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বা করে চলেছি?

১২। আমরা কি বিগত বছরে দুষ্কর্ম ও পাপাচারের যাবতীয় উপলক্ষ্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি? [উল্লেখ্য, মহানবী(সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেয়াও দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতা বলে গণ্য।]

১৩। আমরা কি নিজ নিজ গণ্ডিতে সব ধরনের অত্যাচার-অনাচারের পথ পরিহার করতে পেরেছি?

১৪। আমরা কি সব ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছি?

১৫। আমরা কি সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি? [চরম দুরাচারী এবং পর-নিন্দুক ও পরচর্চাকারীকেও মহানবী(সা.) নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়েছেন।]

১৬। আমরা কি সব ধরনের বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি?

১৭। আমরা কি গত বছর নিজেদেরকে রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি? (সর্বস্তরে অশ্লীলতা ও সর্বগ্রাসী নগ্নতার এ যুগে রিপুর তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করাও একটি জিহাদ।)

১৮। আমরা কি গত বছর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিতভাবে আদায় করতে পেরেছি? (কেননা নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে শিরক ও কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়।)

১৯। আমরা কি বিগত বছরে যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট ছিলাম? [মহানবী(সা.) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট থেকো, কেননা এটি খোদা তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নৈকট্যলাভের উত্তম পন্থা এবং এর অভ্যাস মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে ও পাপমোচন করে। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকেও মানুষকে এটি রক্ষা করে।]

২০। আমরা কি হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর জন্য নিয়মিত বিনা ব্যতিক্রমে দরুদ পাঠ করেছি ও এখনও করে যাচ্ছি? (বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য এটি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ আদেশ আর দোয়া গৃহীত হবার একটি কার্যকর মাধ্যম।)

২১। আমরা কি নিয়মিত ইস্তেগফার করার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২২। আমরা কি নিয়মিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা গাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২৩। আপন-পর নির্বিশেষে যে কাজ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেয়– আমরা কি এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে পেরেছি?

২৪। আমাদের কথায় বা কাজে কেউ যেন আঘাত না পায়– আমরা কি এমনভাবে বছরটি কাটিয়েছি?

২৫। আমরা কি মানুষের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনাসূলভ আচরণ করতে পেরেছি?

২৬। বিগত বছরে বিনয় ও নম্রতা কি আমাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল?

২৭। সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে বা বিপদে– সর্বাবস্থায় আমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছি?

২৮। বিপদাপদের সময় আমরা আল্লাহকে অভিযুক্ত করে ফেলি নি তো?

২৯। সামাজিক কদাচার ও প্রবৃত্তির মোহ থেকে আমরা কি নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি?

৩০। আমরা কি কুরআন শরীফ ও মুহাম্মদ(সা.)-এর নির্দেশাবলী ষোল আনা পালনে সচেষ্ট ছিলাম?

৩১। আমরা কি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পেরেছি?

৩২। আমরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহারের চেষ্টা করেছি কি? (কেননা শিরকের পর অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হল সবচেয়ে বড় আত্মিক পাপ।)

৩৩। গত বছরটিতে আমরা কি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী রপ্ত করার চেষ্টা করেছি?

৩৪। আমরা কি সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতার বৈশিষ্ট অবলম্বন করতে সচেষ্ট থেকেছি?

৩৫। গত বছরের প্রতিটি দিন কি আমরা ধর্মসেবায় এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেছি?

৩৬। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করে থাকি তা সারশূন্য বা বুলি সর্বস্ব নয় তো?

৩৭। আমরা কি ধর্ম সেবাকে নিজেদের ধন-সম্পদের ওপর স্থান দিতে পেরেছি?

৩৮। আমরা কি ধর্মকে নিজ মান-সম্ভ্রমের চেয়েও বেশী মূল্য দিতে পেরেছি?

৩৯। আমরা কি ধর্মকে নিজ সন্তানদের চেয়েও প্রিয়তর জ্ঞান করতে পেরেছি?

৪০। আমরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সচেষ্ট ছিলাম?

৪১। আমরা কি আমাদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করতে সচেষ্ট ছিলাম?

৪২। আমরা কি নিজেদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৩। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততির মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৪। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সাথে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের ও আনুগত্যের সম্পর্ককে আমরা কি ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি যার তুলনায় জগতের সকল সম্পর্ক তুচ্ছ সাব্যস্ত হয়?

৪৫। আমরা কি গত বছর আহমদীয়া খেলাফতের সাথে নিবিড় ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেছি?

৪৬। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে আহমদীয়া খেলাফতের সাথে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি? আর এদিকে তাদের মন আকৃষ্ট হবার জন্য কি দোয়া করেছি?

৪৭। আমরা কি যুগ-খলীফা ও এ জামা'তের জন্য নিয়মিত দোয়া করেছি?

প্রকাশনায়: আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

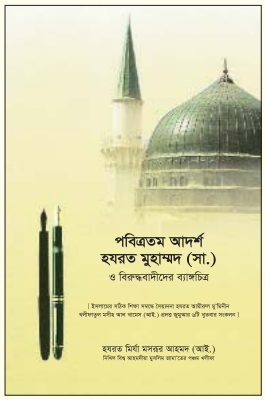

আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ রীতি অনুযায়ী আলো এবং সত্য সর্বদা জয়যুক্ত হয়ে থাকে। যারা অহংকারী এবং দাম্ভিক লোক, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলদের বিরোধীতা করে ঠিকই কিন্তু পরিণতিতে খোদার ক্রোধভাজন হয়। একইভাবে, আজও কতক মানুষ এমন রয়েছে, যারা আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরোধীতায় মত্ত আছে। আল্লাহ্‌র সুন্নত অনুযায়ী তাদের পরিণতিও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনই কতক মানুষ বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ২০০৬ সালে তাদের পত্র-পত্রিকায় মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র মূলক কিছু কার্টুন আঁকে।

২০০৬ সালের ঐ ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মীর্যা মসরূর আহমদ (আই.) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর শান তথা মর্যাদার উপর একাধারে ৫টি খুতবা প্রদান করেন। উক্ত খুতবাগুলি তিনি ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০, ১৭, ২৪ এবং মার্চ মাসের ০৩ ও ১০ তারিখে প্রদান করা হয়। খুতবার এ বইটিকে সমৃদ্ধ করার মানসে ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর আরো ১টি খুতবা সংযোজন করা হলো।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে উক্ত বইটি সংগ্রহ করে তা পাঠ করার জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি আকুল আহ্বান জানাচ্ছি।

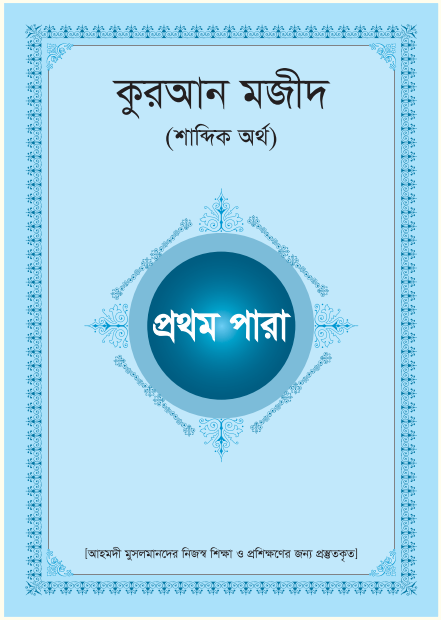

বর্তমান যুগে আমাদের নিকট পবিত্র কুরআন কেবল বাহ্যিকভাবে মূল্যবান বলে পরিগণিত হচ্ছে। অধিকাংশ মানুষই কুরআনের ভিতরে লুক্কায়িত মণি-মুক্তা আহরণের চেষ্টাই করে না। এ কারণে কুরআন মজীদের অর্থ পরিপূর্ণভাবে বুঝার স্বার্থে এই প্রথম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অনুবাদ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হল। আশা করি জামা'তের সকলেই এ থেকে উপকৃত হবেন।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে এটি সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নি যেন এটি অধ্যয়ন করেন, সে আবেদন রইল।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক **"আহমদী"** পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহককে বিনীতভাবে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী জুলাই ২০১৭ থেকে আপনাদের মধ্যে যাদের গ্রাহক চাঁদা ৭৫০ টাকা অর্থাৎ ৩ বছরের অধিক বকেয়া রয়েছে তাদের পত্রিকা আর সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। অতএব নিজ-নিজ গ্রাহক চাঁদা অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার বিনীত আহ্বান জানানো হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯, ০১৭৯৮-০৪০৪৫৮,
০১৭১৭-৯৯৭৩০৬

বিজ্ঞাপণের জন্য যোগাযোগ করুন

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

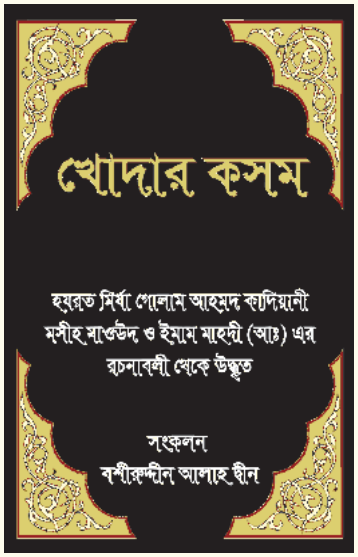

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে উদ্ধৃত একটি সংকলন 'খোদার কসম' নামক বইটিতে তিনি (আ.) খোদার নামে কসম খেয়ে তাঁর সত্যতার প্রমাণের জন্য যে কথা বলেছেন তা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটি পড়লে একজন পাঠক স্পষ্টতঃ এটি বুঝতে পারে যে, একজন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হলে কখনো এভাবে খোদার নামে কসম খেয়ে এমন প্রতাপান্বিত কথা বলতে পারে না। ভারতের প্রখ্যাত বশীরুদ্দীন আলাহ দ্বীন সাহেব এ বইটি সংকলন করেন। বর্তমানে বাংলা ভাষাতেও এটি পাওয়া যাচ্ছে। তবলীগের জন্য উপযোগী উক্ত বইটি সংগ্রহ করে তা পাঠ করার জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 79 | 22nd Issue
The Fortnightly Ahmadi
Since 1922
31st May, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমূত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টোরা
ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

“জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন ’আলা
ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী”

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com